আখিরাতের

জীবনচিত্র

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

আখিরাতের
জীবন চিত্র

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

আখিরাতের জীবন চিত্র

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী

অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০৪ জুলাই

প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ কোবা কম্পিউটার এন্ড এ্যাডভারটাইজিং

৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স

৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ১০০ টাকা মাত্র

Akhirater Jibon Chittra

Moulana Delawar Hossain Sayedee

Co-operated by Moulana Rafeeq bin Sayedee

Copyist : Abdus Salam Mitul

Published by Global publishing Network, Dhaka.

First Edition 2004 July

Price : One Hundred Tk only

Eight Doller (U.S) Only

Five Pound Only

যা বলতে চেয়েছি

মানুষ মৃত্যুর পরের জীবন তথা বিচার দিবস সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে, এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতেই মৃত্যুর পরে জীবনদানের প্রক্রিয়া সংঘটিত করেছেন, যেন মানুষের মনে কোন ধরনের সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধতে না পারে। অস্তিত্বহীন মানুষকে তিনি অস্তিত্ব দান করেছেন, আবার তিনিই তাকে মৃত্যুদান করবেন। আবার তিনিই পুনরায় জীবনদান করে বিচার দিবসে একত্রিত করবেন। কিভাবে করবেন, তিনি তা মানুষকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিয়েছেন। পৃথিবীতে মানুষের চোখের সামনে মৃত জিনিসগুলোকে পুনরায় জীবনদান করে মানুষকে দেখানো হয়, এভাবেই তিনি বিচার দিবসে মানুষকে পুনরায় জীবনদান করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কর্মগুলোকে শক্তিমত্তার দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন সাক্ষী দেয় যে, তিনি যখনই ইচ্ছা করবেন, তখনই সমস্ত মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। ইতোপূর্বে যাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, তাদেরকে তিনি অস্তিত্ব দান করেছেন। অপরদিকে আল্লাহর কাজগুলোকে যদি তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি সাক্ষী দেয় যে, তিনি মানুষকে পুনরায় জীবনদান করে হিসাব গ্রহণ করবেন।

বর্তমান কালে যেমন কিছু সংখ্যক মানুষ ধারণা করে, পৃথিবীর এই জীবনই শেষ জীবন। পুনরায় আর জীবন লাভ করা যাবে না তথা পরকাল বলে কিছু নেই। এই ধারণা নতুন কিছু নয়-একই ধরনের ধারণা সুদূর অতীত কাল থেকেই এক শ্রেণীর ভোগবাদী পরকাল অবিশ্বাসী মানুষ পোষণ করে আসছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সে সময়েও মানুষের ধারণা ছিল, মানুষকে পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মানুষ এখানে যা ইচ্ছে তাই করবে। এমন কোন উচ্চশক্তির অস্তিত্ব নেই, যার কাছে মানুষ তার যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে বাধ্য। মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন নেই। পৃথিবীতে সংঘটিত কোন কর্মকান্ডের হিসাব কারো কাছেই দিতে হবে না। এই ধারণা মারাত্মক ভুল। পরকাল অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং সেদিন সকল কাজের জবাবদিহি মহান আল্লাহর কাছে করতে হবে। পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি ব্যতীত মানুষ কোনোক্রমেই পৃথিবীতে সৎ-চরিত্রবান হতে পারে না। এ জন্য পবিত্র কোরআন-হাদীসে পরকালের বিষয়টি সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলের হৃদয়ে পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি সজাগ করে দিন।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্‌সীর

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি

কর্তৃক রচিত বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

তাফসীরে সাঈদী

সূরা আল ফাতিহা, সূরা আল আসর, সূরা লুকমান, আমপারা

আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ

আল কোরআনের মানদণ্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা

দ্বীনে হক-এর প্রতি দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা

আল কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান

মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন

বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-১ ও ২

শাহাদাতই জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২

আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি

আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?

হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন

শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে

কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়?

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মোনাজাত

আল্লাহ কোথায় আছেন?

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা

আলোচিত বিষয়

আল কোরআনের দিকে আহ্বান

মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাত। কিন্তু এই নে'মাত মুসলমানদের কাছে মওজুদ থাকার পরও বিশ্বব্যাপী মুসলমানরাই সর্বাধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এর কারণ হলো, অধিকাংশ মুসলমানরা কোরআনের দাবী অনুসারে জীবন পরিচালনা করছে না। মুসলমানদের হারানো গৌরব ফিরে পাবার জন্য কোরআন নির্দেশিত পথে ফিরে আসতে হবে। এ জন্য মুসলমানদেরকে কোরআন নির্দেশিত পথের দিকে আহ্বান জানানো আমাদের সকলের কর্তব্য। আমাদের বহুমুখী ব্যস্ততার কারণে আমরা ইচ্ছে থাকার পরও সকলকে কোরআনের পথে আহ্বান জানাতে পারছি না। ফলে অগণিত মুসলমান কোরআন নির্দেশিত পথের সন্ধান পাচ্ছে না।

মানুষ যেন সহজেই কোরআন নির্দেশিত পথের সন্ধান পায় এ জন্য গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক-ঢাকা একটি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আপনি যে এলাকায় বাস করেন অথবা যেখানে আপনার কর্মক্ষেত্র, সে এলাকায় মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, পাঠাগার, ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি রয়েছে। এসব স্থানে আপনি **তাফসীরে সাঈদী** উপহার দিয়ে কোরআনের প্রতি আহ্বান জানানোর দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণ করে মহান আল্লাহর রহমতের একজন অংশীদার হতে পারেন। আপনার উপহার দেয়া বা দান করা এই তাফসীর পাঠ করে একজন মানুষও যদি কোরআন নির্দেশিত পথের সন্ধান লাভ করে, তাহলে আপনার আমলনামায় নেকী জমা হবার যে শুভ সূচনা হবে, তা আপনার ইন্তেকালের পরও অগণিত বছর ব্যাপী জমা হতেই থাকবে। আর এর নিশ্চিত বিনিময় হলো, আপনি কিয়ামতের কঠিন দিনে উপকৃত হবেন– যেদিন কেউ কাউকে উপকার করার জন্য এগিয়ে আসবে না।

আপনি যদি কোথাও তাফসীরে সাঈদী উপহার দিতে চান অথবা আপনার মরহুম পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের লক্ষ্যে দান করতে চান তাহলে আপনার পরামর্শ মত নিম্নের নমুনা অনুসারে আপনার নামের একটি ব্যক্তিগত স্টীকার তাফসীর খন্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় লাগিয়ে দেয়া হবে।

তাফসীরে সাঈদীর এই খন্ডটি দান করেছেন

মুহ্তারাম/ মুহ্তারেমা..

এই তাফসীর খন্ডটি দান করার উসিলায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দানকারীর পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে পৃথিবী এবং আখিরাতে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ

হে আল্লাহ! কোরআনের সম্মানে তুমি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো।

আল্লামা সাঈদী সাহেব কর্তৃক রচিত তাফসীরে সাঈদী অথবা অন্য যে কোনো গ্রন্থ দান করতে বা উপহার দিতে ইচ্ছুক হলে ফোন অথবা পত্রের মাধ্যমেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

পরকালীন জীবনের প্রয়োজনীয়তা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। পৃথিবী ও আকাশ এবং এর মধ্যস্থিত কোন কিছুই নিছক খেয়ালের বশে সৃষ্টি করা হয়নি। তাঁর এই সৃষ্টি কোন শিশুর খেলনার মতো নয়। শিশুদের মতো মনের সান্ত্বনা লাভ ও মন ভুলানোর জন্য কোন খেলনার মতো করে এই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়নি যে, শিশু কিছুক্ষণ খেলে তৃপ্তি লাভ করার পরে উদ্দেশ্যহীনভাবে একে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল অথবা অবহেলা আর অনাদরে রেখে দিল বা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে দিল। নিজের দেহ থেকে শুরু করে আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির প্রতি সাধারণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই এমন ধারণা করার কোন অবকাশ থাকে না। বরং তাঁর এ সৃষ্টি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, ঐকান্তিকতা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, এ কথা দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে যায়।

সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি পরতে পরতে বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এবং এর প্রতিটি অধ্যায়ে লক্ষ্যও স্থির করা হয়েছে। সৃষ্টির অভ্যন্তরীণ একটি পর্যায় সমাপ্ত ও অতিবাহিত হবার পরে আল্লাহ তা'য়ালা নিশ্চিতভাবে যাবতীয় কার্যের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী অধ্যায় রচিত করবেন। তিনি সমগ্র সৃষ্টিসমূহকে মহাসত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরে সংস্থাপিত করেছেন। সৃষ্টির প্রতিটি দিক ন্যায়বিচার, সত্যতার নিময়-নীতি ও বিচক্ষণতার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছুর বাদশাহী একমাত্র তাঁরই এবং তিনি যখন ইচ্ছা পোষণ করবেন, তখনই আদেশ দানমাত্র সৃষ্টির প্রতিটি অনু-পরমাণু তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে বাধ্য। সূরা আন্‌আ'ম-এর ৭৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ-وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ-قَوْلُهُ الْحَقُّ-وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ-عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ-وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ-

তিনিই আকাশ ও যমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং যেদিন তিনি বলবেন, হাশর হও, সেদিনই হাশর হবে। তাঁর কথা সর্বাত্মকভাবে সত্য এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন নিরঙ্কুশ বাদশাহী তাঁরই হবে। গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতায়, তিনি অত্যন্ত সুবিজ্ঞ, সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত।

সৃষ্টিজগতে সাধারণ মানুষ চর্মচোখে যা কিছু দেখতে পাচ্ছে এবং বিজ্ঞানীগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যা কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন, সবকিছুর ভেতরে প্রতিনিয়ত

একটি পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন সৃষ্টির শুরু থেকেই চলে আসছে। উর্ধ্বজগত ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে। সৃষ্টির নিপুণতা ও বিজ্ঞ-কৌশলীর নান্দনিক নির্মাণ শৈলী দেখে এ কথা ভাবার কোন যুক্তি নেই যে, এসব কিছু শিশুর খেলার ছলে সৃষ্টি করা হয়েছে।

বরং সৃষ্টিসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টির ব্যাপারে গভীর উদ্দেশ্যবাদের স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায়। সুতরাং, স্রষ্টাকে যখন বিজ্ঞানী, যুক্তিবাদী বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে এবং তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার স্পষ্ট নিদর্শন মানুষের সামনে বিরাজমান, তখন তিনি মানুষকে জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি, নৈতিক চেতনা, স্বাধীন দায়িত্ব ও প্রয়োগ-ক্ষমতা দেয়ার পর তার জীবনে কৃত ও সংঘটিত কার্যাবলীর কোন হিসাব গ্রহণ করা হবে না এবং বিবেক ও নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তিতে শাস্তি ও পুরস্কার লাভের যে অধিকার অনিবার্যভাবে জন্মে থাকে, তা স্রষ্টা নিষ্ফল ও ব্যর্থ করে দিবেন এ ধারণার কোন সত্যনিষ্ঠ ভিত্তি থাকতে পারে না। সূরা ইউনুস-এর ৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَالِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ–

আল্লাহ তা'য়ালা এসব কিছুই স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন।

বর্তমান কালে যেমন কিছু সংখ্যক মানুষ ধারণা করে, পৃথিবীর এই জীবনই শেষ জীবন। পুনরায় আর জীবন লাভ করা যাবে না তথা পরকাল বলে কিছু নেই। এই ধারণা নতুন কিছু নয়–একই ধরনের ধারণা সুদূর অতীত কাল থেকেই এক শ্রেণীর ভোগবাদী পরকাল অবিশ্বাসী মানুষ পোষণ করে আসছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সে সময়েও মানুষের ধারণা ছিল, মানুষকে পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মানুষ এখানে যা ইচ্ছে তাই করবে। এমন কোন উচ্চশক্তির অস্তিত্ব নেই, যার কাছে মানুষ তার যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে বাধ্য। জীবন একটিই–সুতরাং যা খুশী, যেমনভাবে খুশী জীবনকে ভোগ করতে হবে। মৃত্যুর পরে আর কোন দ্বিতীয় জীবন নেই। পৃথিবীতে সংঘটিত কোন কর্মকান্ডের হিসাব কারো কাছেই দিতে হবে না।

অতএব জীবনকালে সম্পাদিত কোন কাজের জন্য কোন শাস্তি ও পুরস্কার লাভের কোন প্রশ্নই আসে না। জীবন সৃষ্টিই হয়েছে ভোগ করার জন্য। অতএব জীবনকে কানায় কানায় ভোগ করতে হবে। তারপর একদিন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

এদের ধারণা হলো, পৃথিবী হলো দৃশ্যমান। এর অস্তিত্ব চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে। অতএব এটাকেই যে কোন প্রক্রিয়ায় ভোগ করতে হবে। আর পরকালের বিষয়টি হলো বাকি। সেটা হবে কি হবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যে বিষয়টি সংশয়পূর্ণ, সেটাকে প্রাধান্য দিয়ে পৃথিবীর ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকা সম্পূর্ণ বোকামী। বহুদূর থেকে যে বাদ্য ঝংকার ভেসে আসছে, তা শোনার মধ্যে কোন তৃপ্তি নেই। চাক্ষুষ দর্শনের ভিত্তিতে যে হৃদয়গ্রাহী মনমাতানো বাদ্য ঝংকার উপভোগ করা যায়, তার ভেতরেই রয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। পরকালে অবিশ্বাসী এসব ধারণা ও চিন্তা-চেতনা প্রকৃতপক্ষে এ কথাই ব্যক্ত করে যে, বিশ্ব জগতের সমগ্র ব্যবস্থা নিছক একজন খেলোয়াড়ের খেলা ব্যতিত আর কিছুই নয়। কোন গুরুগম্ভীর ও পরিকল্পনা ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এই সৃষ্টিজগৎ পরিচালিত হচ্ছে না। এদের এই যুক্তিহীন ধারণার প্রতিবাদ করে সূরা আম্বিয়ায় মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ-لَوْ أَرَدْنَا
أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَدُنَّا-اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ-

এ আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছুই রয়েছে এগুলো আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। যদি আমি কোন খেলনা সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হতাম এবং এমনি ধরনের কিছু আমাকে করতে হতো তাহলে নিজেরই কাছ থেকে করে নিতাম।

মহান আল্লাহ বলেন, আমি খেলোয়াড় নই। খেল-তামাসা করা আমার কাজ নয়। আর এই পৃথিবী একটি বাস্তবানুগ ব্যবস্থা। কোন ধরনের মিথ্যা শক্তি পৃথিবীর মাটিতে টিকে থাকে না। মিথ্যা যখনই এই পৃথিবীতে স্বদম্ভে নিজের ক্ষয়িঞ্চু অস্তিত্ব প্রকাশ করেছে, তখনই সত্যের সাথে তার অনিবার্য সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছে। আমার পরিকল্পনা ভিত্তিক সৃষ্টি এই পৃথিবীকে তুমি খেলাঘর মনে করে জীবন পরিচালিত করো অথবা আমার বিধানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মতবাদ রচিত করে তার ভিত্তিতে নিজেদেরকে পরিচালিত করে থাকো, তাহলে এসবের পরিণতিতে তুমি নিজের ধ্বংসই ডেকে আনবে।

তোমার নিকট ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, আমার সৃষ্টিকে যারা খেলাঘর মনে করেছে, পৃথিবীকে যারা ভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ একটি বিশালাকারের থালা মনে করেছে, পৃথিবীকে যারা ভোগ-বিলাসের লীলাভূমি মনে করেছে, আমার ইসলামের সাথে যারা বিরোধিতা করেছে, তাদের কি করুণ পরিণতি ঘটেছে, পৃথিবীটাকে ভ্রমণ করে দেখে নাও। তোমরা কি এ কথা মনে

করেছো নাকি যে, তোমাদেরকে আমি এমনিই খেলাচ্ছলে আমোদ-আহ্লাদ করার জন্য সৃষ্টি করেছি? তোমাদের সৃষ্টির পেছনে কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই-নিছক একটি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি হিসাবে বানিয়ে পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছি, তোমাদের কোন কাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে না, এ কথা ভেবেছো নাকি? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ-

তোমরা কি মনে করেছিলে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না? (সূরা মু'মিনূন-১১৫)

গোটা বিশ্বের কোন একটি অণুও অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তা যথার্থ সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে এবং একটি দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনায় এটি পরিচালিত হচ্ছে। সমস্ত সৃষ্টির প্রতিটি অণু ও পরমাণু এই কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সমস্ত জিনিস পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে নির্মিত হয়েছে। গোটা সৃষ্টির ভেতরে একটি আইন সক্রিয় রয়েছে। দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সমস্ত কিছুই উদ্দেশ্যমুখী। মানব জাতির সমগ্র সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থব্যবস্থা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এই কথারই সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে স্রষ্টা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের পেছনে সক্রিয় নিয়ম-নীতি উদ্ভাবন করে এবং প্রতিটি বস্তু যে উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করেই মানুষ এখানে এসব কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। যদি একটি অনিয়মতান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টির মধ্যে একটি খেলনার মতো মানব জাতিকে রেখে দেয়া হতো, তাহলে তাদের পক্ষে কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা চিন্তাই করা যেত না।

অতএব যে অসীম বৈজ্ঞানিক সত্তা এমন প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যমুখীতা সহকারে এই পৃথিবী নির্মাণ করেছেন এবং এর ভেতরে মানুষের মতো একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে যাবতীয় দিক দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক শক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, ইচ্ছা ও স্বাধীন ক্ষমতা এবং নৈতিক অনুভূতি দিয়ে স্বীয় পৃথিবীর অসংখ্য উপকরণ মানুষের হাতে অর্পণ করেছেন, তিনি মানুষকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করতে পারেন, এমন কথা কি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কল্পনা করতে পারে? মানুষ কি এ কথা মনে করেছে যে, তারা এই পৃথিবীতে ভাঙবে, গড়বে, অন্যায় কর্ম করবে, সৎ কর্ম করবে, ভোগ করবে, ত্যাগ করবে এরপর একদিন মৃত্যুবরণ করে মাটির সাথে মিশে

যাবে-তারপর তোমরা যে কাজ করে গেলে, তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না, এটা কি করে কল্পনা করলে? তোমরা নানাজনে নামা ধরনের কাজ করবে, তোমাদের কোন কাজের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তোমাদের মৃত্যুর পরও অসংখ্য নিরীহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকবে, তোমরা এমন একটি মতবাদ বা নিয়ম-নীতির প্রতিষ্ঠিতা করে যাবে, এর ফলে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে অরাজকতা চলতে থাকবে, মানুষ তার নিষ্ঠুর পরিণতি ভোগ করতে থাকবে, আর তোমাদের মৃত্যুর পরই এসব কর্মের হিসাব গ্রহণ না করে তা গুটিয়ে নিয়ে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হবে, এ কথাই কি তোমরা কল্পনা করো? পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا-

আমি আকাশ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে জগৎ রয়েছে তাকে অনর্থক সৃষ্টি করিনি। (সূরা সা'দ-২৭)

সেই আদিকাল থেকেই পরকাল বা বিচার দিবসকে সামনে রেখে মানব সমাজ পরস্পর বিরোধী দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল মানুষ ভেবেছে পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন, মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই। আরেক দল যুক্তি প্রদর্শন করেছে, মানুষ পৃথিবীতে যা কিছুই করছে, এর পূর্ণাঙ্গ হিসাব দিতে হবে। পরকালের প্রতি যারা অবিশ্বাস পোষণ করে, তাদের কথার পেছনে যুক্তি একটিই রয়েছে, 'পরকাল বলে কিছুই নেই' এই কথাটি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন যুক্তি তাদের কাছে নেই। আর পরকাল যে অবশ্যম্ভাবী, এ কথার পেছনে অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণ বিদ্যমান।

সাধারণভাবে এই পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের জীবন একইভাবে পরিচালিত হয় না। মানব সমাজে দেখা যাচ্ছে, কোন মানুষ তার গোটা জীবন ব্যাপীই অন্যের অবহেলা, অবজ্ঞা, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা, অত্যাচার, শোষণ-নির্যাতন-নিষ্পেষণ সহ্য করে আসছে। প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকার কারণে তাকে এসব কিছু সহ্য করে একদিন মৃত্যুর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। এখানে ইনসাফের দাবি ছিল, ঐ ব্যক্তির প্রতি যে অন্যায়-অবিচার অন্য মানুষে করলো, তার সুষ্ঠু বিচার হওয়া। সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিতাবস্থায় সে পৃথিবীর বন্ধন ত্যাগ করলো। গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে লোকটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে আগ্রহী হয়, তাহলে তা কখনোই সম্ভব হবে না। সুতরাং এখানে ইনসাফ দাবি করছে যে, মৃত্যুর পরে আরেকটি জগৎ থাকা উচিত। যে জগতে

পৃথিবীতে অধিকার বঞ্চিত ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল শক্তির অধিকারী নেতার ষড়যন্ত্রের কারণে গোটা জাতি অধিকার বঞ্চিত হয়, দেশের স্বাধীনতা হারিয়ে ভিন্ন জাতির গোলামী করতে বাধ্য হয়, ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় নেতৃবৃন্দের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ অসহায় জনগণ প্রাণ দিতে বাধ্য হয় অথচ বাস্তবে দেখা গেল, সেই নেতার গোপন ষড়যন্ত্রের কথা কোনদিন প্রকাশিত হলো না এবং তার কোন বিচারও হলো না। একশ্রেণীর মানুষ সেই ষড়যন্ত্রকারী রক্ত লোলুপ হিংস্র নেতাকে দেবতার আসনে আসীন করে পূজা করলো। মৃত্যুর পরেও সেই নেতার মূর্তি নির্মাণ করে, প্রতিকৃতি বানিয়ে ফুল দিয়ে পূজা করতে থাকলো।

এ অবস্থায় জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি, ইনসাফ কি দাবি করে? দাবি তো এটাই করে যে, ষড়যন্ত্রকারী নেতার গোপন ষড়যন্ত্র জাতির সামনে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। তার ষড়যন্ত্রের কারণে জাতি পরাধীন জাতিতে পরিণত হলো, অসংখ্য মানুষ নির্মমভাবে নিহত হলো। এসব অপরাধের কারণে তাকে চরম দন্ডে দন্ডিত করা উচিত ছিল। কিন্তু সে দন্ড ভোগ করা তো দূরের কথা, জীবিতকালে বিপুল ঐশ্বর্য্য আর ভোগ-বিলাসের মাধ্যম দিয়ে সে কানায় কানায় তার জীবনকে পূর্ণ করলো। তারপর মৃত্যুর পরেও তার দলের লোকজন তার সীমাহীন বিশ্বাসঘাতকতা আর ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ জাতির কাছে গোপন করে তার প্রতিকৃতি বেদীতে স্থাপন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে পূজা করতে বাধ্য করলো।

এভাবে গোটা জাতিকেই ইনসাফ থেকে বঞ্চিত করা হলো এবং প্রকৃত অপরাধীকে দন্ড দানের পরিবর্তে আকাশ চুম্বী সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হলো। যদি বলা হয় যে, জাতীয় সেই নেতাকে চরম দন্ডদান করলেই তো জাতি ইনসাফ লাভ করলো। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কিভাবে সেই বিশ্বাসঘাতক নেতাকে দন্ড দান করা হবে? তার অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কি তাকে দন্ডদান করা যাবে? খুব বেশী হলে তাকে মৃতুদন্ড দিয়ে তা কার্যকর করা যেতে পারে।

আবার প্রশ্ন ওঠে, যে ব্যক্তি জাতীয় নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে গোটা জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ধ্বংস করলো, জাতিকে ভিন্ন জাতির গোলামে পরিণত করলো, অবাধে নিজে সন্তান-সন্ততি সাথে করে জাতীয় অর্থ-সম্পদ লুট করলো, দলের লোকদের দিয়ে লুট করালো, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানী ঘটালো। তার কারণে অসংখ্য নারী সতীত্ব হারালো—অর্থাৎ বিশাল পর্বত সমান অপরাধের পরিবর্তে

লাভ করলো শুধু মৃত্যুদন্ড। অগণিত মানুষ নিহত হলো যার কারণে, আর সে একবার মাত্র নিহত হলো–এটা কি ইনসাফ হলো ? আসলে মানুষ ইনসাফ করবে কিভাবে? মানুষের পক্ষে তো সম্ভব নয়, লক্ষ লক্ষ নরহত্যার অপরাধে দন্ডিত ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বার হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। মানুষের পক্ষে কাউকে একবারই হত্যা করা বা মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা সম্ভব–বার বার নয়। এখানেও ইনসাফের দাবি হলো, মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন থাকা উচিত। যেখানে লক্ষ নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত অপরাধীকে লক্ষ বার শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

পৃথিবীর কারাগারগুলোয় যেসব বন্দী রয়েছে, এসব বন্দীদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিই কি প্রকৃত অপরাধী? কোন একটি দেশের সরকারও এ কথা হলফ করে বলতে পারবে না যে, তার দেশের কারাগারের সকল বন্দী প্রকৃত অপরাধী। এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যারা প্রতিহিংসা, ষড়যন্ত্র, প্রতিশোধ, আক্রোশ ইত্যাদির শিকার হয়ে বছরের পর বছর ধরে অন্যায়ভাবে কারাগারে অমানবিক নির্যাতন ভোগ করছে। আল্লাহর দেয়া পৃথিবীর মুক্ত আলো-বাতাস থেকে নির্দোষ লোকগুলোকে বঞ্চিত করা হয়েছে। স্বামী সঙ্গ থেকে স্ত্রীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সন্তান-সন্ততিকে পিতার স্নেহ থেকে মাহরুম করা হয়েছে।

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তিকে কারাবন্দী করার কারণে তার সংসার তছনছ হয়ে পড়েছে। স্ত্রীকে অপরের বাড়িতে কঠোর শ্রমের বিনিময়ে ক্ষুন্নি বৃত্তি নিবৃত্ত করতে হচ্ছে। নাবালেগ সন্তানগণ শিক্ষা জীবন থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এক মুঠো অন্নের জন্য শ্রম বিক্রি করতে হচ্ছে। এভাবে অবিচার মানব সভ্যতার মেকি মানবাধিকারের গালে বার বার চপেটাঘাত করছে। নেই–কোথাও এদের সুবিচার লাভের এতটুকু আশা নেই। সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তিশালী কামনা তাড়িত ব্যক্তির দৃষ্টি পড়লো গরীব-দিন মজুর এক ব্যক্তির সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি। তার যৌবনকে লেহন করার যাবতীয় প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, তখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সাথে ষড়যন্ত্র করে সেই দিন-মজুরকে চোর বা ডাকাত সাজিয়ে কারাগারে ঢুকিয়ে দিয়ে কয়েক বছর জেল দেয়া হলো। এরপর দিন-মজুরের অসহায় সুন্দরী স্ত্রীকে ভোগ করার অবাধ পরিবেশ সৃষ্টি করা হলো।

এই অবিচারের কোন প্রতিকার করার মতো শক্তি সামর্থ গরীব-দিন মজুরের নেই। তার অর্থ নেই, প্রভাব নেই, প্রতিপত্তি নেই। আইন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সে জামিন

নেবে, সে অর্থও তার নেই। কারণ পৃথিবীতে প্রচলিত মানুষের তৈরী করা আইনের অবস্থা হলো মাকড়শার জালের মতোই। মাকড়শার জালে যেমন কোন শক্তিশালী মাছি আট্‌কা পড়লে তা ছিন্ন করে বের হয়ে যায় এবং দুর্বল কোন প্রাণী ধরা পড়লে সেই জাল ছিন্ন করতে পারে না। মাকড়শা তাকে কুরে কুরে খায়। পৃথিবীতে আইন প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থের কাছে বিক্রি হয়। এখানে অসহায় দুর্বল মানুষগুলোর সুবিচার লাভের কোন আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু মানুষ হিসাবে, মানবাধিকারের দৃষ্টিতে তারও তো সুবিচার পাবার অধিকার ছিল। তাহলে অসহায় আর দুর্বলরা কি কোনদিন সুবিচার লাভ করবে না?

বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, আলজিরিয়া, ম্যাসেডোনিয়া, ফিলিস্তীন, কাশ্মির, সোমালিয়া, ফিলিপাইন, সুদান, আফগানিস্থান ও ইরাকসহ অনেক দেশেই মুসলিম বিদ্বেষী পৃথিবীর সুপার পাওয়ার মোড়ল রাষ্ট্রটির প্রত্যক্ষ মদদে অগণিত মুসলিম নারী-পুরুষ আবাল বৃদ্ধ-বণিতা লোমহর্ষক হত্যা কান্ডের শিকারে পরিণত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। পৃথিবীতে এদের জন্মই যেন হয়েছে নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে জীবনকে বলী দেয়া। পৃথিবীবাসীর চোখে ধূলো দেয়ার জন্য তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বছরের পর বছর ধরে রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ বৈঠকের নামে ভোজ সভার আয়োজন করছে। প্রকৃতপক্ষে হত্যাযজ্ঞকে দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যেই বৈঠকের নামে কলক্ষেপণ করা হচ্ছে। একদিকে হত্যাযজ্ঞ বন্দ করার নামে যে মুহূর্তে বৈঠক চলছে, অপরদিকে সেই মুহূর্তেই অগণিত আদম সন্তান মারণাস্ত্রের নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হচ্ছে। এভাবে সর্বত্র চলছে অন্যায় আর অবিচার। কিন্তু কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা আজ পর্যন্তও করা হয়নি। বিচারের আশায় অসহায় মানুষের করুণ আর্তনাদ অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠের কঠিন দেয়ালে মাথা কুটে ফিরছে। নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর মর্ম যন্ত্রণার করুণ হাহাকার পৃথিবী জুড়ে বেদনা বিধুর পরিবেশ সৃষ্টি করছে। প্রতিকার আর সুবিচার লাভের সামান্য আশার আলোও কোথাও চোখে পড়ছে না।

পৃথিবীর এই বাস্তব অবস্থাই মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, বিচার দিবসের প্রয়োজনীয়তা আর মৃত্যুর পরের জীবনের আবশ্যকতা। পৃথিবীতে যদি যাবতীয় কাজের যথার্থ প্রতিফল লাভের বাস্তব অবস্থা বিরাজ করতো, তাহলে পরকালের জীবন সংশয়পূর্ণ হতো। পৃথিবীতে কর্মের যথার্থ মূল্যায়ন ও প্রতিফল দানের ক্ষমতা মানুষের নেই। এই ব্যবস্থা মানুষ কোনদিনই যথার্থভাবে করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি এটাই দাবি করে যে, এমন একটি

জীবন অবশ্যই থাকা উচিত, যে জীবনে মানুষ তার প্রতিটি কর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল লাভ করবে। আর কর্ম সম্পাদনের পূর্বে যেমন ফল আশা করা যায় না, তেমনি মৃত্যুর পূর্বে মানুষও তার কর্মফল আশা করতে পারে না। কারণ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার কর্মের অবসান ঘটে। এ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিচার দিবস নির্ধারণ করেছেন। সেদিন তিনি প্রতিটি মানুষের কর্মলিপি অনুসারে বিচার কার্য অনুষ্ঠিত করবেন।

সমস্ত কিছুই সৃষ্টি হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য

সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথম বিষয় বলা হলো, কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি হয়নি–সমস্ত কিছুই একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসারে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রতিটি সৃষ্টির পেছনেই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। এরপর মানব জাতির সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসেছে, এসব সৃষ্টি নশ্বর না অবিনশ্বর? এ প্রশ্নের জবাব লাভের জন্য চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন সৃষ্টিসমূহের প্রতি। তারা নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এখানে কোন জিনিসই অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী নয়। প্রতিটি জিনিসেরই একটি নির্ধারিত জীবনকাল নির্দিষ্ট রয়েছে। নির্দিষ্ট সেই প্রান্ত সীমায় পৌঁছানোর পরে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। সামগ্রিকভাবে গোটা সৃষ্টি জগতসমূহও একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে, এ কথা আজ বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। তারা বলছেন, এখানে দৃশ্যমান–অদৃশ্যমান যতগুলো শক্তি সক্রিয় রয়েছে তারা সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ পরিসরে তারা কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত শক্তি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করবে। তারপর কোন এক সময় তারা অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এ ব্যবস্থাটির পরিসমাপ্তি ঘটবে।

সুদূর অতীতকালে যেসব চিন্তাবিদগণ পৃথিবীকে আদি ও চিরন্তন বলে ধারণা পেশ করেছিলেন, তাদের বক্তব্য তবুও সর্বব্যাপী অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি লাভ করতো। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে নাস্তিক্যবাদী ও আল্লাহ বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্ব-জগতের নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক চলে আসছিল, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় চূড়ান্তভাবেই সে ক্ষেত্রে আল্লাহ বিশ্বাসীদের পক্ষে রায় দিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে নাস্তিক্যবাদীদের পক্ষে বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামাবলী গায়ে দিয়ে এ কথা বলার আর কোন অবকাশ নেই যে, এই পৃথিবী আদি ও অবিনশ্বর। কোনদিন এই জগৎ ধ্বংস হবে না, নাস্তিক্যবাদীদের জন্য এ কথা বলার মতো কোন

সুযোগ বিজ্ঞানীগণ আর রাখেননি। তারা কোরআনের অনুসরণে স্পষ্টভাবে মত ব্যক্ত করেছেন যে, এই পৃথিবী ও সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুই একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। অতীতে বস্তুবাদিরা এ ধারণা প্রচলন করেছিল যে, বস্তুর কোন ক্ষয় নেই–বস্তু কোনদিন ধ্বংস হয় না, শুধু রূপান্তর ঘটে মাত্র। তাদের ধারণা ছিল, প্রতিটি বস্তু পরিবর্তনের পর বস্তু–বস্তুই থেকে থেকে যায় এবং তার পরিমাণে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এই চিন্তা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে বস্তুবাদীরা প্রচার করতো যে, এই বস্তু জগতের কোন আদি-অন্ত নেই। সমস্ত কিছুই অবিনশ্বর। কোন কিছুই চিরতরে লয় প্রাপ্ত হবে না।

পক্ষান্তরে বর্তমানে আনবিক শক্তি আবিষ্কৃত হবার পরে বস্তুবাদীদের ধ্যান-ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীগণ বলছেন, শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এবং বস্তু আবার শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই বস্তুর শেষ স্তরে এর কোন আকৃতিও থাকে না এবং এর কোন ভৌতিক অবস্থানও বজায় থাকে না। তারপর Second law of thermo-Dynamics এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এই বস্তুজগৎ অবিনশ্বর নয়, এটা অনন্ত নয় এবং তা হতে পারে না। এই বস্তুজগৎ যেমন শুরু হয়েছে, তেমনি এটি একদিন শেষ হয়ে যাবে। কোরআন সপ্তম শতাব্দীতে যে ধারণা মানব জাতির সামনে পেশ করেছিল, বর্তমানের বিজ্ঞানীগণ তা নতুন মোড়কে মানব জাতির সামনে উত্থাপন করছে।

কোরআন বলেছে, এই জগতের একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে–বিজ্ঞান এ কথার স্বীকৃতি দানে বাধ্য হয়েছে। কোরআন বলেছে, এই সৃষ্টিজগৎ ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে–বিজ্ঞান অনেক জল ঘোলা করে তারপর এ কথার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে যে, সত্যই–মহাশূন্যে সমস্ত কিছু সম্প্রসারিত হচ্ছে। একটি গ্যালাক্সি আরেকটি গ্যালাক্সির কাছ থেকে প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার বেগে অজানার পথে সৃষ্টির সেই শুরু থেকেই ছুটে চলেছে। কোথায় যে এর পরিসমাপ্তি–তা বিজ্ঞান অনুমান করতে যেমন পারছে না, তেমনি অনুমান করতে পারছে না, মহাশূন্য কতটা বিশাল। এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার একদিন সমাপ্তি ঘটবে, তখন শুরু হবে আবার সংকোচন প্রক্রিয়া। মহাশূন্যে সমস্ত কিছুই যে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ–

আমি আকাশ মন্ডলীকে নিজস্ব শক্তিবলে সৃষ্টি করেছি আর একে আমি সম্প্রসারিত করছি। (সূরা যারিয়াত-৪৭)

সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ একসাথে অনেকগুলো গ্যালাক্সির ওপরে গবেষণা করে দেখেছেন যে, সম্প্রসারণের ধরণটা কেমন। তারা দেখতে পেয়েছেন যে, সম্প্রসারণের ধরণটি একটি অন্যটির সমান্তরাল নয়। তারা ধারণা করেন, একটি গ্যালাক্সি অন্য আরেকটি গ্যালাক্সি অথবা একাধিক গ্যালাক্সি ক্রমশঃ দূরত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। বিষয়টিকে তারা সহজবোধ্য করার জন্য বেলুনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একটি বেলুনে বাতাস দিতে থাকলে তা যেমন ক্রমশঃ ফুলতেই থাকে, তারপর তা এক সময় ফেটে যায় এবং রাবারের টুকরোগুলো চারদিকে ছিটকে পড়ে। বেলুন ফুলতে থাকাবস্থায় তার ভেতরের স্থান যেমন সম্প্রসারিত হতে থাকে, তেমনি এই মহাশূন্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। নক্ষত্রসমূহ কোন গ্যালাক্সি ব্যবস্থার পরিমন্ডলে যেমন সম্প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি এই মহাবিশ্ব প্রতি মুহূর্তে প্রবল গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

পৃথিবী এবং গ্যালাক্সী কেন্দ্রের মাঝে অবস্থিত বাহুটি প্রতি সেকেন্ডে তিপ্পান্ন কিলোমিটার বেগে এবং তার বিপরীত বাহুটি প্রতি সেকেন্ডে একশত পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কোন গ্যালাক্সি সেকেন্ডে পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইল বেগে, কোনটি সেকেন্ডে নব্বই হাজার মাইল বেগে আবার কোনটি সেকেন্ডে আলোর গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সৃষ্টির আদি থেকেই এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলছে। কোথায় যে এরা ছুটে যাচ্ছে, তা বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করতে সমর্থ হননি। এই গ্যালাক্সিগুলো একটি আরেকটিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে না। তারা একেবারে সোজা পিছে সরে যাচ্ছে। মহাকর্ষ বলের কারণে প্রতিটি গ্যালাক্সি একে অপরকে আকর্ষণ করে। এরপরও তারা পরস্পরের কাছে ছুটে আসতে পারে না। কারণ গোটা মহাবিশ্ব ব্যাপী একটি সম্প্রসারণ বল সক্রিয় রয়েছে। এই বল এখনো মহাকর্ষ বলের থেকে অনেক বেশী এবং এ কারণেই মহাবিশ্ব সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু মহাকর্ষ বল প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করছে গ্যালাক্সিগুলোকে পরস্পরের দিকে টেনে নিয়ে আসার জন্য। এই মহাকর্ষ বলের কারণেই ক্রমশঃ একদিন গ্যালাক্সিগুলোর পশ্চাদপসরণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এক কথায় মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীগণ মতামত দিচ্ছেন।

তারপর মহার্কষ বলের কারণেই গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরের দিকে ছুটে আসতে শুরু করবে আর এভাবেই শুরু হবে মহাবিশ্বের সংকোচন প্রক্রিয়া। ক্রমান্বয়ে মহাবিশ্ব

কেন্দ্রের দিকে সংকুচিত হতে থাকবে, সময় যতই অতিবাহিত হবে, গ্যালাক্সিগুলোর পরস্পরের প্রতি ছুটে আসার গতি ততই বৃদ্ধি লাভ করবে। এভাবে এক সময় সমস্ত গ্যালাক্সি তাদের যাবতীয় পদার্থ তথা নক্ষত্র, উন্মুক্ত গ্যাস, ধূলিকণা ইত্যাদিসহ মহাবিশ্বের কেন্দ্রে পরস্পরের ওপরে পতিত হবে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, সংকোচনের শেষ পর্যায়ে মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র তথা সৃষ্টি জগতের যাবতীয় পদার্থ, মহাবিশ্বের কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র পিন্ডে পরিণত হবে। সমাপ্তিতে সৃষ্টি জগতের এই একত্রিত অবস্থাকে বিজ্ঞানীগণ বিগ্ ক্রাঞ্চ (Big Crunch) নামে আখ্যায়িত করেছেন।

পৃথিবীর ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যত তথা পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখিত ধারণা পোষণ করছে বর্তমানের বিজ্ঞানীগণ। তারা বলছেন, তাপের উৎস হলো সূর্য। আর এই তাপের কারণেই গোটা সৃষ্টিজগৎ সচল রয়েছে। অথচ এই সূর্য ক্রমশঃ তার জ্বালানি শক্তি নিঃশেষ করে ফেলছে। অর্থাৎ সূর্য একটি পরিণতির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির জন্যই একটি নির্দিষ্ট সীমা রেখা অঙ্কন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ-مَاخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى-

তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করেনি? আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছু সঠিক ও উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর রূম-৮)

এই পৃথিবীতে যা কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অনাদি ও অনন্ত নয়, এ কথা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। দৃষ্টির সামনেই মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে, পুরাতনের স্থানে নতুনের আগমন ঘটছে। কিন্তু এর একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিভাবে-কি করে ঘটবে তা গবেষকদের কাছে আর অনাবৃত নেই।

পরকালীন জীবন প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিবেক ও ইনসাফের দাবী

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসীম দয়ালু–কথাটি অনুধাবন করার জন্য কোন গবেষণার প্রয়োজন নেই। মাত্র একটি বারের জন্য গোটা সৃষ্টির প্রতি এবং নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বিষয়টি দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে যায়।

পবিত্র কোরআনের প্রথম সূরা-সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অসীম দয়া ও অনুগ্রহের কথা মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ কিভাবে কোথায় কার্যকর করেছেন, তা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আলোচনা করে মানব জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে দয়া ও অনুগ্রহের কথা জানিয়েই তিনি ঘোষণা করেছেন-তিনিই বিচার দিবসের মালিক।

দয়া অনুগ্রহ ও বিচার দিবসের মালিক-দুটো বিষয়ের পাশাপাশি উল্লেখ করার কারণ হলো, পৃথিবীর মানব-মন্ডলীর কাছে তিনি এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন-তিনি শুধু অসীম দয়ালুই নন, তিনি ন্যায় বিচারক, ইনসাফকারী, তিনি অধিকার প্রদানকারী। পৃথিবীতে আল্লাহর উন্মুক্ত ও অবারিত দয়া পরিবেষ্টিত থেকে শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে যারা ন্যায় বিচারকে ভূলুণ্ঠিত করছে, অপরের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে, দুর্বলকে ইনসাফ থেকে বঞ্চিত করছে, তিনিই আল্লাহ-যিনি বিচার দিবসে বিচারকের আসনে আসীন হয়ে ন্যায় বিচার করবেন। পৃথিবীতে যারা অধিকার বঞ্চিত ছিল, তাদেরকে তিনি প্রাপ্য অধিকার প্রদান করবেন-ইনসাফ করবেন।

একজন ব্যক্তি দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে মহান আল্লাহর দেয়া জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলো এবং সে নিয়ম-পদ্ধতি দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালালো। প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে সে কারাগারে যেতে বাধ্য হলো, নির্যাতিত হলো, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলো। দেশের জনগণ এবং জাতির কর্ণধারগণ লোকটির আবিষ্কৃত কল্যাণকর নিয়ম-পদ্ধতির কল্যাণকারিতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে অথবা অবহেলা করে তার নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করলো না বরং তার প্রতি নানা ধরনের নির্যাতন অনুষ্ঠিত করলো। এরপর নিয়ম মাফিক লোকটি একদিন এ পৃথিবী থেকে একবুক হাহাকার নিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করলো। তার ইন্তেকালের অনেক বছর পরে নতুনভাবে যারা দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো, তারা এসে দেখলো, ঐ লোকটি কর্তৃক আবিষ্কৃত নিয়ম-পদ্ধতি দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে এবং তারা বাস্তবে তাই করলো। দেশ ও জাতি লোকটির প্রবর্তিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত হলো।

জাতি যখন লোকটির প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম হলো, তখন তার প্রতি শ্রদ্ধায় গোটা জাতি বিগলিত হলো। লোকটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দেশের

বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোর নামকরণ তার নামে করা হলো। প্রতি বছরে তার জন্ম-মৃত্যু দিবসে সংবাদ পত্রসমূহ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলো। তার মূল্যায়ন করে নানা ধরনের বই-পুস্তক প্রকাশ হলো। কেউ কেউ তার আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা শুরু করলো। তার নামে বিভিন্ন ধরনের পদক প্রবর্তন করা হলো।

এসব করা হলো ঐ ব্যক্তির জন্য, যাকে একদিন গোটা জাতি লাঞ্ছিত করেছিল, নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত করেছিল, কারারুদ্ধ করেছিল, তার সহায়-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তাকে দেশান্তরী করেছিল। তারপর লোকটির ইন্তেকালের বহু বছর অতিক্রান্ত হবার পর উপলব্ধিবোধ ফিরে আসার পরে জাতি তাকে পুরস্কৃত করার জন্য উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে বিনিময় দেয়ার যতগুলো পন্থা রয়েছে, তার সবগুলোই অবলম্বন করা হলো।

এখন প্রশ্ন হলো, পরবর্তীতে মৃত সেই লোকটির জন্য যা করা হলো, এসবই কি লোকটির যথার্থ প্রাপ্য ছিল, না এরচেয়ে আরো বেশী কিছু প্রাপ্য ছিল? আর প্রাপ্য থাকলেও মানুষের পক্ষে লোকটির জন্য আরো বেশী কিছু করা কি সম্ভব? মাত্র একটি লোকের প্রচেষ্টায় অসংখ্য অগণিত লোক উপকৃত হলো, একটি দেশ ও জাতি বিশ্বের দরবারে সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হলো, তার কারণে জাতি অনিয়ম, দুর্নীতি, অরাজকতা, বিশৃংখলতা, দারিদ্র থেকে মুক্তি লাভ করে শান্তি ও স্বস্তির জীবন লাভ করলো, তাকে কি কোনভাবেই মানুষের পক্ষ থেকে তার কর্মের বিনিময় স্বরূপ যথার্থ পুরস্কার প্রদান করা সম্ভব?

অনুরূপভাবে আরেকজন লোক এমন এক মতবাদ আবিষ্কার করলো, রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করে এমন নিময়-পদ্ধতির প্রবর্তন করলো এবং একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলো। তার সেই ঘৃণ্য মতবাদের কারণে যুগের পর যুগ ধরে অগণিত মানুষ চরম দুরাবস্থার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হলো। এখন সেই মতবাদের আবিষ্কারককে কি কোনভাবেই দন্ড প্রদান করা সম্ভব? আর মানুষের নিয়ন্ত্রণে যত ধরনের দন্ড রয়েছে, তার সবগুলোই প্রয়োগ করলে কি লোকটিকে যথার্থ দন্ড দেয়া হবে? সুতরাং, মানুষের পক্ষে আরেক জন মানুষের কর্মের যথার্থ মূল্যায়ন করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ মানুষের শক্তি ও সামর্থ সীমিত। এ জন্য মানুষের পক্ষে যথার্থ পুরস্কার ও দন্ড দেয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাহলে কি মানুষ প্রকৃত পুরস্কার ও দন্ড লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে? প্রকৃত পুরস্কার ও দন্ডের ব্যবস্থা

মানুষের আয়ত্বে নেই, এ কারণে মানুষের ভেতরে যে হতাশা, এই হাতাশা বোধেই কি মানবাত্মা অনন্তকাল ধরে আর্তনাদ করতে থাকবে ? এই হতাশা দূর করার জন্যই আল্লাহ রাহ্মান ও রাহীম। তিনি অসীম অনুগ্রহ ও করুণার অধিকারী। পৃথিবীতে যেমন তিনি মানুষের ওপরে অসীম করুণা করেছেন, তেমনি তিনি করুণা করবেন বিচার দিবসে। যেদিন তিনি করুণা করে যথার্থ পুরস্কার ও দন্ডের ব্যবস্থা করবেন এবং ন্যায় বিচার পরিপূর্ণ করার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবেন। এ কারণেই তিনি সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়টি উল্লেখ করার পরপরই তৃতীয় আয়াতে বিচার দিবসের বিষয়টি নিশ্চিত করে মানব জাতিকে হতাশা মুক্ত করেছেন। সূরা হামীম সিজ্দায় মহান আল্লাহ বলেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا-وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ-

যে সৎ কাজ করবে সে নিজের জন্যই কল্যাণ করবে। আর যে দুষ্কর্ম করবে তার মন্দ পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তোমার রবব বান্দাদের জন্য জালিম নন।

যার যা প্রাপ্য তাকে না দেয়াই হলো তার ওপরে জুলুম অনুষ্ঠিত করা এবং পৃথিবীতে এই জুলুম প্রতি মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি এই জুলুমের অবসান কল্পে আর্তচিৎকার করছে। আল্লাহ তা'য়ালা বিচার দিবসে এই জুলুমের অবসান ঘটাবেন। মানুষের জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি এটাই দাবি করছে যে, যথার্থভাবে মানুষের কর্মের মূল্যায়ন ও তদানুযায়ী পুরস্কার এবং দন্ডের আয়োজন করা হোক। আর যেহেতু জীবিত থাকাবস্থায় মানুষের কর্মের মূল্যায়ন করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এজন্য মৃত্যুর পরে আরেকটি বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে সেখানে এসবের ব্যবস্থা করা উচিত। জীবিত কালে মানুষের কর্মের মূল্যায়ন করা এ কারণে সম্ভব নয় যে, মানুষ এমন একটি কর্ম সম্পাদন করলো, যার ফলে গোটা জাতির কাছে সে প্রশংসিত হলো। আবার সেই একই ব্যক্তির দ্বারা এমন এক জঘন্য কর্ম অনুষ্ঠিত হলো, গোটা জাতির কাছে সে নিন্দিত হলো। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ ধরনের নিন্দিত ও প্রশংসিত নেতার অভাব নেই। সারা জীবন ধরে এক ব্যক্তি প্রশংসামূলক কর্ম সম্পাদন করলো, মৃত্যু শয্যায় শায়িত থেকে সেই একই ব্যক্তি, এমন এক নিন্দিত কাজের অনুমোদন দিয়ে গেল যে, গোটা জাতি তার মৃত্যুর পরে শোকাহত হবার পরিবর্তে তার প্রতি ধিক্কারই জানালো। এ জন্য জীবিত থাকাবস্থায় কোন

মানুষের কর্মের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। মানুষের প্রতিটি খুটিনাটি কাজের মূল্যায়ন পূর্বক পুরস্কার ও দন্ডদানের ব্যবস্থার জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে বিচার-দিবস। এটা মহান আল্লাহর উন্মুক্ত ও অবারিত দয়া-অনুগ্রহের অসীম প্রকাশ।

পৃথিবীর বিচারালয় সম্পর্কে মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো, বিচারক স্বয়ং নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে বিচার কার্য অনুষ্ঠিত করে থাকেন। যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিচারক বিচার করেন, সে বিষয়টি যেখানে সংঘটিত হয়, সেখানে বিচারক স্বশরীরে উপস্থিত থেকে ঘটনার প্রতিটি দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার কোন উপায় তার থাকে না। বিচার কার্য পরিচালনার সাথে যারা জড়িত, তাদের কাছ থেকে ঘটনাবলী শুনে বিচারক বিচার করে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও পূর্ণ ঘটনা তার গোচরে আসার সম্ভাবনা নেই। উভয় পক্ষের উকিল এবং সাক্ষীগণ নিজের স্বার্থে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করে থাকে। এক কথায় পৃথিবীতে বিচার কার্য পরিচালনা করার সময় মানুষ বিচারককে যতগুলো দুর্বলতা পরিবেষ্টন করে রাখে, এর সবগুলো থেকে মহান আল্লাহ পাক ও পবিত্র। ঘটনা যেখানে সংঘটিত হয়, তা মহান আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকে না। কেন ঘটনা সংঘটিত হলো, সেটাও তিনি অবগত থাকেন এবং যেখানে যার দ্বারাই সৎকাজ ও অসৎকাজ সংঘটিত হচ্ছে, সমস্ত কিছুই তিনি অবগত থাকেন। আল্লাহ বলেন–

يُسَبِّحُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الاَرْضِ-لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ-وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّ مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ-وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

আল্লাহর তাস্‌বীহ করছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশ জগতে রয়েছে এবং এমন প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীর বুকে রয়েছে। তিনিই সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকারী এবং প্রশংসাও তাঁরই জন্য। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন আর কেউ কাফির। আর আল্লাহ সেসব কিছুই দেখেন যা তোমরা করে থাকো। (সূরা আত তাগাবুন-১-২)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিচার দিবসের মালিক, সৃষ্টিজগতে যা কিছুই রয়েছে সমস্ত কিছুই তাঁর প্রশংসা করছে। সমস্ত সৃষ্টির ওপরে একমাত্র তাঁর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সৃষ্টির ওপরে কারো কর্তৃত্ব চলে না, কর্তৃত্ব একমাত্র

তাঁর। পৃথিবীতে মানুষকে প্রেরণ করে তিনি তাদেরকে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য দেখিয়ে দিয়ে স্বাধীন ক্ষমতা দান করেছেন, মানুষ আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে মুমিনও হতে পারে আবার শয়তানের পথ অনুসরণ করে কাফিরও হতে পারে। মানুষ কোথাও কোন অবস্থায় অন্ধকারে চার দেয়ালের মধ্যে লোক চক্ষুর অন্তারালে কি করছে সেটাও তিনি দেখছেন। সুতরাং একমাত্র তাঁর পক্ষেই যাবতীয় ঘটনার ন্যায় বিচার করা সম্ভব। বিচারক যদি ন্যায় বিচার করে, তাহলে সেটা তার সততা, দয়া ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। আর বিচারক যদি ন্যায় বিচার না করে নির্দোষকে আসামী করে শাস্তি প্রদান করেন আর দোষীকে ক্ষমা করে দিয়ে কোন দন্ডদান না করেন, এটা বিচারকের হীন ও কলুষিত মানসিকতার স্বাক্ষর বহন করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে বিচার দিবসকে নির্দিষ্ট করেছেন এবং সেদিন তিনি ন্যায় বিচারের মাধ্যমে অপরাধীকে দন্ডদান করবেন এবং পুরস্কার লাভের অধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করবেন। সৎকর্মের পুরস্কার হিসাবে যারা জান্নাতে গমন করবেম, তারাও যেমন আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে ধন্য তেমনি যারা অসৎ কাজের বিনিময় হিসাবে জাহান্নামে গমন করবে, তারাও আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও ইনাসাফ লাভ করেই যথাস্থানে গমন করবে। একদল মানুষ শাস্তি লাভের জন্য জাহান্নামে গমন করছে, এটা আল্লাহর ক্রোধের প্রকাশ নয়। এটাও তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের প্রকাশ। কারণ তিনি দয়া করে ন্যায় বিচার করবেন এবং যেখানে যার স্থান তাকে সে স্থানেই প্রেরণ করার ব্যবস্থা করবেন। মানুষের যাবতীয় কার্যাবলী তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তার হৃদয় কি কল্পনা করে, তাও তিনি জানেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَعْلَمُ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتُسِرُّوْنَ وَمَاتُعْلِنُوْنَ–وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ–

পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের প্রতিটি বিষয় তিনি জানেন। তোমরা যা কিছু গোপন করো আর যা কিছু প্রকাশ করো, তা সবই তিনি জানেন। তিনি মানুষের হৃদয়সমূহের অবস্থাও জানেন।

একদিকে আল্লাহ স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে মানুষের গতিবিধি, যাবতীয় কার্যকলাপ ও তার চিন্তা-কল্পনা, কামনা-বাসনা সমস্ত কিছুই জানেন। অপরদিকে প্রতিটি মানুষের সাথে দু'জন করে ফেরেশ্তা নিযুক্ত করেছেন। তারা মানুষের সাথে সম্পর্কশীল প্রতিটি

কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করে রাখছে। মানুষের কোন কথা বা কাজ রেকর্ডের বাইরে অলিখিত থাকে না। বিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে যখনই মানুষকে উপস্থিত করা হবে, তখন পৃথিবীর জীবনে কে কি করেছে, তখন তাদের সামনে তা প্রদর্শন করা হবে।

শুধু তাই নয়, দু'জন ফেরেশ্‌তাও সাক্ষী হিসাবে দন্ডায়মান থাকবেন। তারা মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপের লিখিত ও ধারণকৃত ছবি প্রমাণ হিসাবে পেশ করবেন। বিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে মানুষ পৃথিবীতে যত কথা বলেছিল, সে কথাগুলো নিজের কানে নিজের কণ্ঠেই শুনতে পাবে। শুধু তাই নয়, নিজের চোখ দিয়ে তার যাবতীয় কর্মকান্ডের চলমান ছবি এমনভাবে দেখতে পাবে যে, ঘটনার যথার্থতা ও নির্ভুলতাকে অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। সূরা ক্বাফ-এ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ–وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ–اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ–مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ–

মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমি এবং তার মনে প্রতি মুহূর্তে কখন কি কল্পনা-কামনা-বাসনার উদয় তাও আমি জানি। আমি তার কণ্ঠের শিরার থেকে অত্যন্ত কাছে অবস্থান করছি। দু'জন লেখক তার ডান ও বাম দিকে অবস্থান করে প্রতিটি বিষয় লিপিবদ্ধ করে রাখছে। মানুষ এমন কোন শব্দই উচ্চারণ করে না যা সংরক্ষণের জন্য একজন চির-উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওজুদ থাকে না।

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ন্যায় ও ইনসাফের মুখাপেক্ষী। যার দ্বারায় অন্যায় সংঘটিত হয়, সে ব্যক্তিও তা ন্যায় মনে করে সংঘটিত করে না। তার বিবেকই তাকে কর্মটি সম্পর্কে জানিয়ে দেয় যে–এটা অন্যায় কর্ম। সুতরাং মানুষের দ্বারা সংঘটিত যাবতীয় কর্মই দাবি করে যে, এসব কর্মের চুলচেরা বিচার হওয়া উচিত এবং উপযুক্ত কর্মফল লাভ করা উচিত। আল্লাহ রাহ্‌মান ও রাহীম, এটা তাঁর অসীম অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষের যাবতীয় কর্মফল যথাযথভাবে দান করার জন্যই ইনসাফের দাবি অনুসারে বিচার দিবস নির্দিষ্ট করেছেন।

আখিরাত অস্বীকারকারীদের যুক্তি

মানব-মন্ডলীকে সঠিক পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে এই পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল আগমন করেছেন এবং তাঁরা সকলেই মানুষকে বিচার দিবস সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাঁরা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বিচার দিবস নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু বলছে এবং করছে, বিচার দিবসে এসব কিছুর চুলচেরা বিচার করা হবে ও কর্মলিপি অনুসারে মানুষ পুরস্কৃত হবে এবং দন্ডলাভ করবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনই হলো মানুষের আসল জীবন–সেই জীবনে যে ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে পারবে, সেটাই প্রকৃত সফলতা। আর সেই সফলতা অর্জন করতে হলে পৃথিবীতে মানুষকে অবশ্যই মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করতে হবে। নবী-রাসূলগণ যখনই বিচার দিবসের কথা বলেছেন, তখনই এক শ্রেণীর মানুষ মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে নানা ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করেছে এবং এ ব্যাপারে বিদ্রোহীর ভূমিকা অবলম্বন করেছে। এ ধরনের বিদ্রোহী ভূমিকা শুধু সেই যুগের মানুষই অবলম্বন করেনি, প্রতিটি যুগেই এটা করা হয়েছে। পরকালে অবিশ্বাসী মানুষগুলো প্রতিটি যুগেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করেছে, এখনও করছে এবং পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত করতে থাকবে।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, বিচার দিবসের কথা শোনার সাথে সাথে একশ্রেণীর মানুষ কেন প্রচন্ডভাবে ক্ষেপে উঠেছে এবং প্রবল বিরোধিতার ঝান্ডা উড্ডিন করেছে? কেন তারা নানা ধরনের যুক্তির অবতারণা করে বিচার দিবসকে অস্বীকার করেছে? কেন তারা ঐ লোকগুলোর ওপরে নির্যাতন শুরু করেছে, যারা বিচার দিবস সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেই শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাহলো, যুগে যুগে যারা পরকাল অস্বীকার করেছে, বিচার দিবস সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করেছে, ঐ দিনটি সম্পর্কে বিতর্ক করেছে, এই বিতর্ক-সন্দেহ-সংশয়ের পেছনে একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ সক্রিয় ছিল।

যারা বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসী এই পৃথিবীতে তাদের জীবনধারা হয় এক ধরনের আর যারা বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসী, তাদের জীবনধারা হয় ভিন্ন ধরনের। বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসীদের জীবনধারা হলো, তারা যে কোন কাজই করুন না কেন, তাদের প্রতিটি কথা ও কাজের পেছনে এই অনুভূতি সক্রিয় থাকে যে, আল্লাহর

কাছে বিচার দিবসে জবাবদিহি করতে হবে। এই পৃথিবীতে তারা যা কিছুই বলছে এবং করছে, এসবের জন্য মহান আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। সে যদি কোন অসৎ কথা বলে এবং কাজ করে তাহলে তাকে আল্লাহর দরবারে শাস্তি পেতে হবে। এই পৃথিবীর জীবনই শেষ নয়, মৃত্যুর পরের জীবনই হলো আসল জীবন। সেই জীবনে তাকে সফলতা অর্জন করতে হবে। এই অনুভূতি নিয়ে সে পৃথিবীর জীবনকে পরিচালিত করে।

আর যারা বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসী, পৃথিবীতে তাদের জীবনধারা হলো বল্গাহীন পশুর মতোই। তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ্ বলছেন–

وَقَالُوْاءَ اِذَا ضَلَلْنَا فِى الاَرْضِ ءَانَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ–

আর এরা বলে, যখন আমরা মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? (সূরা আস্ সাজ্দাহ্-১০)

অর্থাৎ এদের বিশ্বাস হলো, মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই। নির্দিষ্ট সময়ের পরে একদিন আমরা মৃত্যুবরণ করবো, যার যার নিয়ম অনুসারে আমাদের অন্তেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে, আমাদের দেহ যেসব উপকরণ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল, সেসব উপকরণ এই পৃথিবীতেই যখন বিদ্যমান রয়েছে, তখন সেসব উপকরণ পৃথিবীতেই মিশে যাবে। কারো দরবারেও আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে না এবং আমাদের কোন কর্ম বা কথা সম্পর্কে কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতেও হবে না। বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসীদের এই অনুভূতির কারণে পৃথিবীতে এদের কথা ও কাজের ব্যাপারে কোন নিয়ম এরা অনুসরণ করে না। তার কথায় কার কি ক্ষতি হতে পারে, কে মনে আঘাত পেতে পারে এসব চিন্তা তারা করে না। নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য এরা যে কোন কাজই করতে পারে। তার কাজের দ্বারা ব্যক্তি বা দেশ ও জাতি কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হলো, এ চিন্তা এদের মনে স্থান পায় না।

এদের একমাত্র চিন্তাধারা হলো, এই পৃথিবীর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন, তা যে কোন কিছুর বিনিময়ে হলেও অর্জন করতে হবে। যৌন অনাচারের মাধ্যমে যদি প্রভূত অর্থ আমদানী করা যায়, তাহলে তা করতে কোন দ্বিধা এদের থাকে না। সুদের প্রচলন ঘটিয়ে, অশ্লীলতার প্রসার ঘটিয়ে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে, মিথ্যা-শঠতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ইত্যাদির মাধ্যমে যদি নিজের স্বার্থ অর্জিত হয়, তাহলে অবশ্যই তা করতে হবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটিই–জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করো। এই জীবন একবার

হারালে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, সুতরাং জীবিত থাকাবস্থায় ভোগের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে হবে। খাও দাও আর ফূর্তি করো-(Eat, Drink and Be Maerry) এটার নামই হলো জীবন।

আল্লাহর বিধান মেনে নিয়ে বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে গেলেই পৃথিবীর জীবন হয়ে যাবে নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহর বিধান বলছে, মানুষের প্রতিটি কথা রেকর্ড করা হচ্ছে এবং বলা কথা সম্পর্কে বিচার দিবসে জবাবদিহি করতে হবে অতএব হিসাব করে কথা বলতে হবে। আল্লাহর বিধান বলছে, যৌন অনাচারের মুখে লাগাম দিয়ে বিয়ের মাধ্যমে বৈধভাবে যৌবনকে ভোগ করতে হবে। অতএব ফুলে ফুরে ঘুরে বিচিত্র উপায়ে যৌবনকে আর ভোগ করা যাবে না। আল্লাহর বিধান বলছে, বৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন করতে হবে-এতে যদি সংসারে টানাটানি দেখা দেয় তবুও অবৈধ উপার্জনের পথ অবলম্বন করা যাবে না। অতএব অবৈধভাবে উপার্জন বন্ধ হবে, ভোগ-বিলাসের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, কালো টাকার পাহাড় গড়ার রাস্তা বন্ধ হবে, অপরের স্বার্থে আঘাত হানার যাবতীয় পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

এক কথায় গোটা জীবনকে একটি নিয়মের অধীন করে দিতে হবে। তাহলে তো পৃথিবীতে যেমন খুশী তেমনভাবে চলা যাবে না, জীবনকেও ভোগ করা যাবে না। সুতরাং আল্লাহর ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস-এই মতবাদকে কোনক্রমেই মেনে নেয়া যাবে না এবং এই মতবাদ যেন দেশের বুকে প্রচার না হতে পারে, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ, এই মতবাদ দেশের বুকে প্রচার করতে দেয়া হলে, দেশের জনগণ ক্রমশঃ এই মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, এই মতবাদে বিশ্বাসীদের দল ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করবে, তখন এদের চাপে বাধ্য হয়েই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

উল্লেখিত কারণেই নবী-রাসূলদের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে এবং সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলন যারা করছে, তাদের সাথে বিচার দিবস অস্বীকারকারীদের সাথে সংঘাত চলছে। বিচার দিবসকে যারা অস্বীকার করে তারা ভোগবাদে বিশ্বাসী। জীবনকে কানায় কানায় ভোগ করার প্রবণতাই এদেরকে বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসী করেছে। এই চিন্তাধারার অধিকারী ব্যক্তিগণই জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। জীবনের একভাগে থাকবে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে কোনক্রমেই ধর্ম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আর দ্বিতীয় ভাগে ব্যক্তি জীবনে যদি কেউ ধর্ম অনুসরণ করতে

আগ্রহী হয়, তাহলে সে ব্যক্তিগতভাবে তা অনুসরণ করতে পারে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না আর এটারই নাম দেয়া হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসের প্রবণতাই জন্ম দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। নির্যাতন নিষ্পেষনের অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়েই ইসলামী আন্দোলন অগ্রসর হয়েছে এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসীদের সংখ্যা এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, অবিশ্বাসীরা তখন প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বাসীদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি না করে শঠতা আর ধূর্ততার চোরা পথে এগিয়ে গিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ অনুসরণ করলে একদিকে যেমন জীবনকেও যথেচ্ছাভাবে ভোগ করা যাবে, অপরদিকে বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতি সক্রিয় রেখে যারা জীবন পরিচালিত করতে আগ্রহী, তারাও ব্যক্তিগত জীবনে তাদের আদর্শানুসারে চলতে পারবে। ফলে উভয় দলের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাতও দেখা দিবে না এবং ধর্মনিরপেক্ষতার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে দেশে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হবে, সেই পরিবেশই মানুষের অন্তর থেকে বিচার দিবসে জবাবদিহির অনুভূতি বিদায় করে দেবে। এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা নাস্তিক্যবাদকে বিকশিত করার ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করে থাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অন্যান্য নবী-রাসূলগণ যখন সত্য সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তোমরা যদি অন্যায় পথেই চলতে থাকো, তাহলে বিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। তখন তারা রাসূলের আহ্বানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে নানা ধরনের ভিত্তিহীন যুক্তি প্রদর্শন করেছে। তাদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন–

اِنْ هِىَ اِلاَّ مَوْتَتُنَا الاُوْلَى وَمَانَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ-

এরা বলে, আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতিত আর কিছুই নেই। এরপর আমাদের পুনরায় আর উঠানো হবে না। যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে আনো। (সূরা আদ দুখান-৩৫-৩৬)

অর্থাৎ মানুষের জীবনে মৃত্যু বার বার আসে না–একবারই আসে। এই একবারেই মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। যারা বিচার দিবসের কথা বলে, তারা যদি তাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়, তাহলে আমাদের পূর্বে যারা এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে, তাদের ভেতর থেকে দু'চারজনকে উঠিয়ে নিয়ে এসে প্রমাণ করে দিক যে, মৃত্যুর পরেও আরেকটি জীবন রয়েছে।

এ ধরনের হাস্যকর যুক্তি শুধু সে যুগেই প্রদর্শন করা হয়নি, বর্তমান যুগেও তথাকথিত বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। মূল বিষয় হলো সময়। সময় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এই সময়ই মানুষকে ক্রমশঃ নিঃশেষের দিকে নিয়ে যায়। কালের গর্ভে সমস্ত কিছুই বিলীন হয়ে যায়। কালের অন্ধকার বিবরে একবার যা প্রবেশ করে তা পুনরায় ফিরে আসে না। মানুষ এক সময় শিশু থাকে, কালের বিবর্তনে এই শিশু একদিন বৃদ্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের যুক্তি তথাকথিত বিজ্ঞানের যুগেই দেয়া হচ্ছে না। যে যুগটিকে মূর্খতার যুগ (Days of ignorance) নামে অভিহিত করা হয়, সেই যুগেও একই যুক্তি প্রদর্শন করা হতো। তারা কি যুক্তি প্রদর্শন করতো, এ সম্পর্কে সূরা জাসিয়ার ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা শোনাচ্ছেন–

وَقَالُوْا مَاهِىَ الاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَاوَمَا يُهْلِكُنَا الاَّ الدَّهْرُ–

এরা বলে, জীবন বলতে তো শুধু আমাদের পৃথিবীর এই জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না।

বিচার দিবস সম্পর্কে যারা সন্দেহমূলক প্রশ্ন তোলে, তারা এ ধরনের বালখিল্য যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে। মানুষ ইন্তেকাল করে এবং আর কোনদিন ফিরে আসে না, এটাই এদের কাছে বড় প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরে আর দ্বিতীয় কোন জীবন নেই। ইন্তেকালের পরে মানুষের দেহ পচে যায়, মাটির সাথে গোস্ত মিশে যায়। রয়ে যায় হাড়গুলো, তারপর সে হাড়ও একদিন মাটির সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মানুষের আর কোনই অস্তিত্ব থাকে না। বিচার দিবসে বিশ্বাসীগণ যখন বলেন, মাটির মিশে যাওয়া অস্তিত্বহীন মানুষই বিচার দিবসে পুনরায় দেহ নিয়ে উত্থিত হবে, তখন এদের কাছে বিষয়টি বড় অদ্ভূত মনে হয়। বিস্ময়ে এরা প্রশ্ন করে, অস্তিত্বহীন মানুষ কি করে পুনরায় অস্তিত্ব লাভ করবে? এটা অসম্ভব! সুতরাং বিচার দিবস বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এদের বলা কথাগুলো মহান আল্লাহ এভাবে কোরআনে পরিবেশন করেছেন–

وَقَالُوْا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًاءَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا–

তারা বলে, আমরা যখন শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করে উঠানো হবে? (সূরা বনী ইসরাঈল-৪৯)

শুধু তাই নয়, বিচার দিনের ব্যাপারটিকে তারা বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করে থাকে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানুষকে পরকালে জবাবদিহির বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতেন, তখন তারা বলতো, লোকটি নিজে এ সম্পর্কে কথা রচনা করে তা আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছে অথবা তার মাথা ঠিক নেই। কারণ মাথা ঠিক থাকলে সে কি করে বলে যে, মাটির সাথে হাড়-মাংস মিশে যাওয়া মানুষ পুনরায় নিজের অস্তিত্বে প্রকাশ হয়ে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করবে? এই লোকগুলো পথ চলতে যার সাথেই দেখা হতো, তার কাছেই রাসূল সম্পর্কে বিদ্রূপ করে যে কথাগুলো বলতো, তা পবিত্র কোরআন এভাবে পেশ করেছে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ-اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ-اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ

অবিশ্বাসীরা লোকদেরকে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলবো, যে ব্যক্তি এই ধরনের সংবাদ দেয় যে, যখন তোমাদের শরীরের প্রতিটি অণু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তখন তোমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া হবে, না জানি এই ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে, না কি তাকে পাগলামিতে পেয়ে বসেছে। (সূরা সাবা-৭-৮)

মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে কোরআনের যুক্তি

অবিশ্বাসীদের যুক্তি হলো, এ পর্যন্ত কোন মানুষ ইন্তেকাল করার পরে পুনরায় ফিরে আসার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই, সুতরাং পরকালে মানুষকে পুনরায় জীবিত করো হবে, এ কথা কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। তারা চ্যালেঞ্জ করে বলতো যে, যদি সত্যই বিচার দিবস নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, সেদিন আল্লাহর আদালতে মৃত মানুষগুলো জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করার বিষয়টি সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের পূর্বে যারা ইন্তেকাল করেছে, তাদের মধ্য থেকে যে কোন ব্যক্তিকে জীবিত করে এনে আমাদেরকে দেখাও–তাহলে আমরা বিশ্বাস করবো, বিচার দিবস বলে কিছু আছে। এদের এই দাবিই অপ্রাসঙ্গিক।

কারণ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর অনুসারীগণ বর্তমান সময় পর্যন্ত এমন কথা কখনো বলেননি যে, আমরা মৃত মানুষকে জীবিত করে দেখাতে পারি। ইশারা ইঙ্গিতেও তারা কখনো এ ধরনের অমূলক দাবি করেননি। তাহলে যে বিষয়ে কোন কথা বলা হয়নি বা দাবি করা হচ্ছে না, সে বিষয়কে কেন প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে? তাদের উদ্দেশ্য

একটিই আর তাহলো, তারা বিচার দিবসকে মেনে নেবে না। বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ইচ্ছে থাকলে তর্কের রীতি অনুসরণ না করে অপ্রাসঙ্গিক কথা টেনে আনা হতো না।

মৃতকে জীবিত যদি কেউ দেখতে আগ্রহী হয়, তাহলে কবরের মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত না করে প্রথমে নিজের দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। প্রতিদিন অসংখ্য দেহকোষ কিভাবে মৃত্যুবরণ করছে এবং কিভাবে নতুন দেহকোষ জীবিত হচ্ছে। প্রাণহীন ভ্রূণ থেকে কিভাবে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু জন্ম লাভ করছে। মানুষের জন্মের বিষয়টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। এক বিন্দু নাপাক পানির মধ্যে এমন কি রয়েছে, যা চোখে দেখা যায় না। তা থেকে কিভাবে পূর্ণাঙ্গ একটি মানব শিশু প্রস্তুত হয়ে পৃথিবীতে আগমন করছে। ক্রমশঃ সেই শিশু একটি সুন্দর দেহধারী মানুষে পরিণত হচ্ছে। এভাবে মানব সৃষ্টির গোটা প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে কি মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়ার বিষয়টিকে অসম্ভব বলে মনে হয়? প্রাণী জগতের দিকে তাকালেও সেই একই বিষয় ধরা পড়ে। ডিমগুলোর মধ্যে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই, অথচ সেই ডিম থেকে কিভাবে জীবিত বাচ্চা পৃথিবীতে বেরিয়ে আসছে।

চৈত্র মাসের খর-তাপে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। নদী-নালা-খাল-বিল-হাওড় শুকিয়ে মরুভূমির মতো হয়ে যায়। এক সময় যেখানে সবুজের সমারোহ ছিল, দৃষ্টি-নন্দন নৈসর্গিক দৃশ্য বিরাজিত ছিল। প্রচন্ড দাবদাহে সেখানে কোন মানুষের পক্ষে মুহূর্ত কাল দাঁড়ানো কষ্টকর হয়ে ওঠে। যমীন প্রাণশক্তি হারিয়ে মৃত পতিত আকার ধারণ করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا-كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ-

আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন তারপর তা মেঘমালা উঠায় এরপর আমি তাকে নিয়ে যাই একটি জনমানবহীন এলাকার দিকে এবং মৃত-পতিত যমীনকে সঞ্জীবিত করে তুলি। মৃত মানুষদের জীবিত হয়ে ওঠাও তেমনি ধরনের হবে। (সূরা ফাতির-৯)

বিচার দিবস তথা পরকাল হবে কি হবে না, এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য কোন গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। পদতলে নিষ্পেষিত দুর্বা ঘাসগুলোর দিকে তাকালেই অনুভব করা যায়। বিশেষ মৌসুমে এই ঘাসগুলো গালিচার মতোই হয়ে ওঠে।

সৌন্দর্য পিয়াসী ব্যক্তিগণ নরম তুলতুলে এই ঘাসগুলোর ওপরে শুয়ে নীল আকাশের সৌন্দর্য উপভোগ করে। কবি, সাহিত্যিকদের কল্পনার বন্ধ দুয়ার দ্রুত অর্গল মুক্ত হয়। আবার বিশেষ এক মৌসুমের আগমন ঘটে, তখন সেই সুন্দর ঘাসগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। যে স্থানে সবুজ ঘাসের নীল গালিচার ওপরে শুয়ে কবি একদিন তার কল্পনার বন্ধ দুয়ার অর্গল মুক্ত করেছিল, সে স্থানে সবুজের কোন চিহ্ন থাকে না, রুদ্র প্রয়াগের তপ্ত নিঃশ্বাস আর মৃতের হাহাকার সেখানে ভেসে বেড়ায়।

এরপর মাত্র এক পশলা বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তারপর মৃত-ভূমি অকস্মাৎ সবুজ শ্যামল আভায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো এবং দীর্ঘকালের মৃত শিকড়গুলো সবুজ চারাগাছে রূপান্তরিত হয়ে মাটির বুকে আবার বিছিয়ে দিল নমনীয় নীল গালিচা। দৃষ্টি বিমোহিত এই দৃশ্য দেখেও কি মনে হয়, মৃত মানুষকে পুনরায় আল্লাহর পক্ষে জীবন দান করা অসম্ভব? এসব কিছু দেখার পরেও বিচার দিবস সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে? সূরা হজ্জ-এর ৫ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ–وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَانَشَاءُ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ–

হে মানব মন্ডলী ! যদি তোমাদের মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা জেনে রেখো, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর রক্তপিন্ড থেকে, তারপর গোশ্‌তের টুকরা থেকে, যা আকৃতি বিশিষ্টও হয় এবং আকৃতিহীনও হয়। (এসব বর্ণনা করা হচ্ছে) তোমাদের কাছে সত্য সুস্পষ্ট করার জন্য। আমি যে শুক্রকে চাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত গর্ভাশয়ে স্থিত রাখি, তারপর একটি শিশুর আকারে তোমাদের বের করে আনি, (তারপর তোমাদের প্রতিপালন করি) যেন তোমরা পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে যাও।

বিচার দিবসে কিভাবে মাটির সাথে মিশে যাওয়া মানুষগুলো পুনরায় জীবিত হবে, এ ব্যাপারে যদি তোমাদের কারো মনে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয় তাহলে তোমরা নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখো, তোমরা কি ছিলে। তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। এমন এক ফোটা পানি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করা হলো,

যে পানি দেহ থেকে নির্গত হলে গোসল ফরজ হয়ে যায়। সেখানে তোমাদেরকে আমি অস্তিত্ব দান করেছি। তারপর তোমাদেরকে আমিই প্রতিপালন করে সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী যুবকে পরিণত করি। এভাবে তোমাদেরকে আমি প্রথমবার যখন সৃষ্টি করেছি, তখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কি আমার পক্ষে অসম্ভব মনে করো? শুধু তাই নয়, অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে তোমাদেরকে আমিই সৃষ্টি করে মাতৃগর্ভ থেকে শিশুর আকারে পৃথিবীতে এনে যুবকে পরিণত করি। এরপর তোমাদেরকে আমি কোন পরিণতিতে পৌঁছে দেই শোন–

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا–

আর তোমাদের মধ্য থেকে অনেককেই তার পূর্বেই আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসি এবং কাউকে হীনতম বয়সের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যেন সবকিছু জানার পরেও আর কিছুই না জানে। (সূরা আল হাজ্জ-৫)

তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, সেখান থেকে অস্তিত্ব দান করলাম। তারপর তোমাদেরকে কৈশোর, যুবক ও বৃদ্ধাবস্থার দিকে নিয়ে যেতে থাকি। এভাবে নিয়ে যাওয়ার মধ্যস্থিত সময়ে অনেককেই আমি মৃত্যু দান করি। তোমরা কেউ কিশোর অবস্থায়, তরুণ বয়সে, যুবক বয়সে মৃত্যুবরণ করো। আবার কাউকে কাউকে আমি বয়সের এমন এক প্রান্তে পৌঁছে দেই, তখন সে নিজের শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন যত্ন নেয়া দূরে থাক, সংবাদই রাখতে সক্ষম হয় না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যকে জ্ঞান বিতরণ করতো, সে বয়সের শেষ প্রান্তে পৌঁছে শুধু শিশুর মতো জ্ঞানহীনই হয়ে যায় না, একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তির এত পাণ্ডিত্য ছিল, জ্ঞান ছিল, নানা ধরনের বিদ্যা অর্জন করেছিল, বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে বিশেষজ্ঞ ছিল, কত অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা ছিল। তার এসব গর্বের বস্তুকে এমনই অজ্ঞতায় পরিবর্তিত করে দেই যে, একদিন তার কথা অসংখ্য জ্ঞানী মানুষ নিবিষ্ট চিত্তে মনোযোগ দিয়ে শুনতো, এখন তার কথা শুনলে ছোট্ট একটি শিশুও হাসে। কোথা থেকে তোমাদেরকে আমি কোন অবস্থায় নিয়ে আসি, তা দেখেও কি তোমরা বুঝো না, বিচার দিবসে তোমাদেরকে আমি একত্রিত করতে সক্ষম হবো? রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ

وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ-ذَالِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّه يُحْيِ الْمَوْتٰى وَأَنَّه عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-وَأَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا-وَأَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ-

আর তোমরা দেখছো যমীন বিশুষ্ক পড়ে রয়েছে তারপর যখনই আমি তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি তখনই সে সবুজ শ্যামল হয়েছে, স্ফীত হয়ে উঠেছে এবং সবধরনের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদ্গাত করতে শুরু করেছে। এসব কিছু এজন্য যে, আল্লাহ সত্য, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী। আর এই (এ কথার প্রমাণ) যে, কিয়ামতের সময় অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে উঠাবেন যারা কবরে চলে গিয়েছে। (সূরা আল হাজ্জ-৫-৭)

যারা বিচার দিবস সম্পর্কে সন্দেহ সংশয়ের আবর্তে দোলায়িত হচ্ছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ আছেন একথা অবশ্যই সত্য। মানুষ যখন মরে গিয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে, তারপর তাদের আর জীবিত হবার কোনই সম্ভাবনা নেই—যারা এ ধারনা পোষণ করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আল্লাহর অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক কোন বিষয় নয়। কোন বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা পরিহার করার লক্ষ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব আবিষ্কার করা হয়নি।

তিনি নিছক দার্শনিকদের চিন্তার আবিষ্কার, অনিবার্য সত্তা ও সকল কার্যকারণের প্রথম কারণই নয় বরং তিনি প্রকৃত স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তা, যিনি সময়ের প্রতি মুহূর্তে নিজের অসীম শক্তিমত্তা, সংকল্প, জ্ঞান ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ এবং এর প্রতিটি বস্তু পরিচালনা করছেন। তিনি খেয়ালের বশে এসব কিছু সৃষ্টি করেননি। এসব সৃষ্টি করার পেছনে কোন শিশু সুলভ মনোভাবও কাজ করেনি যে, শিশুর মতো খেলা শেষ হলেই সমস্ত কিছুই ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ ধূলায় উড়িয়ে দেয়া হবে। বরং তিনি সত্য এবং তাঁর যাবতীয় কাজই গুরুত্বপূর্ণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ। বিজ্ঞানের সুষমায় প্রতিটি সৃষ্টিই সুষমা মন্ডিত।

বিচার দিবসের প্রতি যারা সন্দেহ পোষণ করে, তারা যদি সৃষ্টি জগতের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্মের প্রক্রিয়া নিয়ে সামান্য চিন্তা করে, তাহলে সে অবগত হতে পারবে যে, একজন মানুষের অস্তিত্বের ভেতরে মহান আল্লাহর প্রকৃত ও বাস্তব ব্যবস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল প্রতি মুহূর্তে সক্রিয়

রয়েছে। প্রতিটি মানুষের অস্তিত্ব, বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রত্যেকটি পর্যায়েই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্বেচ্ছামূলক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। অবিশ্বাসীরা বলে থাকে যে, এসব সৃষ্টির পেছনে কোন নিয়মতান্ত্রিক স্রষ্টা বলে কেউ নেই। যা ঘটছে তা একটি প্রাকৃতিক নিয়মের অধিনেই ঘটছে।

পক্ষান্তরে এই হতভাগারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাবে যে, প্রতিটি মানুষ যেভাবে অস্তিত্ব লাভ করে এবং তারপর যে প্রক্রিয়ায় অস্তিত্ব লাভের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, তার ভেতরে একজন সুবিজ্ঞ, মহাবিজ্ঞানী ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী প্রচন্ড শক্তিশালী সত্তার ইচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত কিভাবে সুপরিকল্পিত পন্থায় সক্রিয় রয়েছে। মানুষের গ্রহণকৃত খাদ্যের মধ্যে কোথাও মানবিক বীজ গোপন থাকে না যা মানবিক প্রাণের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। গ্রহণকৃত খাদ্য উদরে প্রবেশ করে কোথাও গিয়ে রক্ত, কোথাও গিয়ে হাড়, কোথাও গিয়ে গোশ্তে পরিণত হয়। আবার বিশেষ স্থানে তা পৌছে গ্রহণকৃত সেই খাদ্যই এমন শুক্রে পরিণত হয়, যার ভেতরে যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ মানুষের পরিণত হবার যোগ্যতার অধিকারী বীজ লুকায়িত থাকে। এই লুকায়িত বীজের সংখ্যা এতটা অধিক যে, একজন পুরুষ থেকে প্রতিবারে যে শুক্র নির্গত হয় তার মধ্যে কয়েক কোটি শুক্রকীট অবস্থান করে এবং তার প্রতিটি নারীর ডিম্বাণুর সাথে মিশে মানুষের রূপ লাভ করার যাবতীয় যোগ্যতা ধারণ করে। কিন্তু একজন মহাবিজ্ঞানী, অসীম শক্তিশালী একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন শাসকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেই অসংখ্য শুক্রকীটের মধ্য থেকে মাত্র একটিকে নির্বাচিত করে নারীর ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হবার সুযোগ করে দেয়া হয়। এভাবে চলে গর্ভধারণ প্রক্রিয়া এবং গর্ভধারণের সময় পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্বকোষের মিলনের ফলে প্রাথমিক অবস্থায় এমন একটি জিনিস অস্তিত্ব লাভ করে এবং সেটা এতই ক্ষুদ্র যে, তা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিত চোখে দেখা সম্ভব নয়।

সেই ক্ষুদ্র জিনিসটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গর্ভাশয়ে প্রতিপালিত হয়ে বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে অপূর্ব সুন্দর একটি দেহ কাঠামো ধারণ করে পূর্ণাঙ্গ একটি মানুষে পরিণত হয়। মানুষের জন্মের প্রতিটি জটিল স্তরের বিষয়টি সম্পর্কে কেউ চিন্তা করলেই তার মন-মস্তিষ্ক দ্বিধাহীন চিত্তে দৃঢ়ভাবে সাক্ষী দেবে যে, এসব বিষয়ের ওপরে প্রতি মুহূর্তে একজন সদা তৎপর মহাবিজ্ঞানীর ইচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত সঠিক পন্থায় কাজ করছে। সেই সুবিজ্ঞ মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তা'য়ালাই সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন,

কোন মানুষকে তিনি পূর্ণতায় পৌঁছাবেন, কাকে তিনি ভ্রূণ অবস্থাতেই শেষ করে দিবেন, কাকে তিনি গর্ভে দেহ কাঠামো দেয়ার পরে শেষ করবেন, কাকে তিনি পৃথিবীতে আসার পরে প্রথম নিঃশ্বাস গ্রহণের সুযোগ দেবেন অথবা দেবেন না।

মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যেই তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কাকে তিনি জীবিত নিয়ে আসবেন আর কাকে তিনি মৃত নিয়ে আসবেন। কাকে তিনি মাতৃগর্ভ থেকে সাধারণ মানুষের আকার আকৃতিতে বের করে আনবেন, আবার কাকে তিনি অস্বাভাবিক কোন আকার দিয়ে পৃথিবীতে আনবেন। কাকে তিনি সুন্দর অবয়ব দান করে আনবেন অথবা কুৎসিত অবয়ব দান করে পৃথিবীর আলো-বাতাসে নিয়ে আসবেন। কাকে তিনি পূর্ণাঙ্গ মানবিক অবয়ব দান করবেন অথবা বিকলাঙ্গ করে আনবেন। কাকে তিনি পুরুষ হিসাবে আনবেন অথবা কাকে তিনি নারী হিসাবে আনবেন। কাকে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার মতো যোগ্যতা দিয়ে আনবেন, অথবা কাকে তিনি একেবারে নির্বোধ-বোকা হিসাবে পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন।

মানুষের সৃজন ও আকৃতিদানের এসব প্রক্রিয়া সময়ের প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর অসংখ্য নারীর গর্ভাশয়ে বিরামহীন গতিতে সক্রিয় রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার ভেতরে কোন একটি পর্যায়েও একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত পৃথিবীর কোন একটি শক্তিও সামান্যতম প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ নয়। এসব অসম্ভব প্রক্রিয়া দেখেও কেউ যদি বলে যে, বিচার দিবসে মানুষকে পুনরায় জীবনদান করা অসম্ভব ব্যাপার–তাহলে তাকে হতভাগা ও নির্বোধ ব্যতিত আর কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যেতে পারে?

মহান আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করবেন, এ কথা শুনে অবাক হবার কিছুই নেই। প্রতিটি বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা কোন প্রক্রিয়ায় মৃতকে জীবিত করছেন। এখানে পুনরায় বলতে হচ্ছে, গ্রহণকৃত খাদ্যের যেসব উপাদান দ্বারা মানুষের দেহ গঠিত হচ্ছে এবং যেসব উপকরণ দ্বারা সে প্রতিপালিত হচ্ছে, সেসব উপায়-উপকরণসমূহ বিশ্লেষণ করলে নানা ধরনের পদার্থ ও অন্যান্য উপাদান পাওয়া যাবে কিন্তু জীবন ও মানবাত্মার কোন বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব তার ভেতরে পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে এসব মৃত, নির্জীব উপায়, উপকরণগুলোর সমাবেশ ঘটিয়েই মানুষকে একটি জীবিত ও প্রাণের স্পন্দন সম্বলিত অস্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। তারপর নানা উপাদান সম্বলিত খাদ্য মানুষের শরীরে পরিবেশন করা হয় এবং দেহের অভ্যন্তরে গ্রহণকৃত খাদ্যের

নির্যাসের সাহায্যে পুরুষের মধ্যে এমন শুক্রকীট এবং নারীর মধ্যে এমন ডিম্বকোষের সৃষ্টি হয়, যাদের মিলিতরূপে প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত মানুষ প্রস্তুত হয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাসে বের হয়ে আসছে।

আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে মৃত থেকে জীবিত বের করেন, মানুষ দেখতে পারে তার চার পাশের পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে। বাতাস, পাখি ও অন্যান্য প্রাণী অসংখ্য উদ্ভিদের বীজ ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে রাখে। নানা ধরনের উদ্ভিদের মূল মাটির সাথে মিশে ছিল। এসবের মধ্যে উদ্ভিদ জীবনের সামান্যতম লক্ষণও বিদ্যমান ছিলনা। এসব বীজ ও মূল যেন কবরে প্রথিত রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। ওমনি উদ্ভিদের নিষ্প্রাণ বীজ আর বৃক্ষমূলগুলো মাটির কবর থেকে চারাগাছ রূপে মাথা উঁচু করে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করলো। মৃতকে জীবিত করার এই দৃষ্টি নান্দনিক দৃশ্য—এসব দেখেও যারা মনে করে, বিচার দিবসে আল্লাহর পক্ষে মৃত মানুষদেরকে জীবিত করা অসম্ভব, তাদেরকে চোখ-কান থাকার পরেও অন্ধ-বধির বিশেষণে বিশেষিত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় থাকে না।

সৃষ্টিজগতের এসব নিদর্শনই বলে দিচ্ছে যে, মহান আল্লাহ অসীম শক্তিশালী এবং সেই শক্তির সামান্য অংশ প্রয়োগ করেই তিনি বিচার দিবসে মৃতদেরকে জীবিত করবেন। উদ্ভিদের জীবনধারার মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার মক্তিমত্তার যে অভাবনীয় কর্মকুশলতা দেখা যায়, সেগুলো দেখার পর কি কোন জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা বলতে পারে যে, সৃষ্টিজগতে এ পর্যন্ত যেসব কর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্পাদন করা হয়েছে এবং হচ্ছে, আল্লা[illegible]বের বাইরে আর কোন নতুন কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম?

এ ধরনের অবাঞ্ছিত ধারণা আল্লাহ সম্পর্কে যারা করেন, তাদের কাছে আমরা বিনয়ের সাথে নিবেদন করতে চাই, মানুষের সম্পর্কে স্বয়ং মানুষের ধারণা আজ থেকে মাত্র এক শতাব্দী বা পঞ্চাশ বছর পূর্বে কেমন ছিল? বাষ্প ইঞ্জিন আবিষ্কারের পূর্বে এই মানুষ ধারণা করতে সক্ষম হয়নি যে, তারা এরচেয়ে বড় কোন কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। অথচ তারা ঐ বাষ্প ইঞ্জিনের থেকেও লক্ষ কোটি গুণে কার্যোপযোগী যন্ত্রযান নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৭ সনে আমি যখন লন্ডন সফর করি তখন সেখানের কিছু লোকজন আমাকে এমন একটি ডিজিটাল ডায়েরী দিয়েছিল, যার ভেতরে অসংখ্য তথ্য সংরক্ষণ করা ছাড়াও হাজার হাজার টেলিফোন নম্বর সংরক্ষণ করা যায়। এই ধরনের ডায়েরী মানুষ আবিষ্কারে সক্ষম

হবে, এ কথা তারা মাত্র কিছুদিন পূর্বেও কল্পনা করতে পারেনি। মানুষ কম্পিউটার আবিষ্কার করেছে। এই কম্পিউটারের ভেতরে গোটা পৃথিবীর অসংখ্য তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। এভাবে প্রযুক্তিগত দিক থেকে মানুষ যে উন্নতি করছে, কিছুদিন পূর্বেও মানুষ এসব বিষয় সম্পর্কে কল্পনা করতে সক্ষম হয়নি। মহাশূন্য যান সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা ছিল না। অথচ বর্তমানে তা কঠিন বাস্তবতা এবং এসব দেখে মানুষ আর বিস্ময়বোধ করে না। সীমিত ক্ষমতার অধিকারী মানুষের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে যখন কোন সীমা নির্ধারণ করা যায় না, অথচ এই মানুষ কি করে সেই অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর কর্ম ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে বলে যে, মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবন দেয়া আল্লাহর পক্ষে সম্ভব নয় এবং বিচার দিবসে তিনি সমস্ত মানুষকে একত্রিত করতে পারবেন না? তিনি এ পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, এসবের থেকে অন্য কিছু নতুন করে সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়?

অথচ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টির নিপুণতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করছে যে, তিনি অসীম ক্ষমতা ও বিজ্ঞতার অধিকারী। তিনিই মানুষকে হাসিয়ে থাকেন আবার তিনিই মানুষকে কাঁদিয়ে থাকেন। জীবন ও মৃত্যুর বাগডোর একমাত্র তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। সূরা নাজ্‌ম-এর ৪৩ থেকে ৪৮ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

وَاَنَّهُ هُوَاَضْحَكَ وَاَبْكَى-وَاَنَّهُ هُوَاَمَاتَ وَاَحْيَا-وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى-مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى-وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرَى-وَاَنَّهُ هُوَاَغْنَى وَاَقْنَى-

আর এই যে, তিনিই মানুষকে আনন্দানুভূতি দিয়েছেন এবং তিনিই দুঃখানুভূতি দিয়েছেন। তিনিই মৃত্যু দিয়েছেন এবং তিনিই জীবনদান করেছেন। তিনিই পুরুষ ও স্ত্রীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এক ফোটা শুক্র থেকে যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়। দ্বিতীয়বার জীবনদান করাও তাঁরই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তিনিই ধনী বানিয়েছেন এবং বিষয়-সম্পত্তি দান করেছেন।

নিত্য নতুন নানা ঘটনা আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘটিয়ে চলেছেন। পত্র-পত্রিকায় মাঝে মধ্যে সংবাদ পরিবেশিত হয়, মানুষ চোখেও দেখে থাকে, মাতৃগর্ভের গর্ভাশয়ে একসাথে পাঁচটি দশটি পর্যন্ত সন্তান আল্লাহ্ দান করে থাকেন। এসব দেখেও মানুষ কি করে ধারণা করে, নতুনভাবে তিনি দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারবেন না? আল্লাহ সূরা বাকারার ২৮ নং আয়াতে প্রশ্ন করছেন–

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَتًا فَاَحْيَاكُمْ-ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

তোমরা আল্লাহর সাথে কি করে কুফুরীর আচরণ করতে পারো ? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনিই তোমাদেরকে জীবনদান করেছেন। তারপর তিনিই তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং পুনরায় তিনিই তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অবশেষে তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

মানুষ মৃত্যুর পরের জীবন তথা বিচার দিবস সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে, এ জন্য তিনি পৃথিবীতেই মৃত্যুর পরে জীবনদানের প্রক্রিয়া সংঘটিত করেছেন, যেন মানুষের মনে কোন ধরনের সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধতে না পারে। অস্তিত্বহীন মানুষকে তিনি অস্তিত্ব প্রদান করেছেন, আবার তিনিই তাকে মৃত্যুদান করবেন। আবার তিনিই পুনরায় জীবনদান করে বিচার দিবসে একত্রিত করবেন। কিভাবে করবেন, তিনি তা মানুষকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا-

এ কথা ভালোভাবে জেনে নাও যে, পৃথিবীর এই মৃত যমীনকে তিনিই জীবনদান করেন। (সূরা হাদীদ–১৭)

পৃথিবীতে মানুষের চোখের সামনে মৃত জিনিসগুলোকে পুনরায় জীবনদান করে মানুষকে দেখানো হয়, এভাবেই তিনি বিচার দিবসে মানুষকে পুনরায় জীবনদান করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কর্মগুলোকে শক্তিমত্তার দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন সাক্ষী দেয় যে, তিনি যখনই ইচ্ছা করবেন, তখনই সমস্ত মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। ইতিপূর্বে যাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, তাদেরকে তিনি অস্তিত্ব দান করেছেন। অপরদিকে আল্লাহর কাজগুলোকে যদি তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি সাক্ষী দেয় যে, তিনি মানুষকে পুনরায় জীবনদান করে হিসাব গ্রহণ করবেন।

মানুষ যে সীমিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করেছে এর অনিবার্য ফল হিসাবে দেখা যায় যে, তারা যখনই নিজের অর্থ-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য অন্য কারো হাতে সোপর্দ করে দেয়, তখন এমনটি কখনো ঘটে না যে, সে কোন হিসাব গ্রহণ করে না। কারো কাছে কোন কিছু সোপর্দ করলে সে তার পূর্ণ হিসাব গ্রহণ করে। পিতা তার

সন্তানের পেছনে অর্থ ব্যয় করে সন্তান যেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। সন্তান কোন কারণে তা অর্জন করতে ব্যর্থ হলে পিতা তাকে বলে, এবার হিসাব দাও–তোমার পেছনে আমি এত কষ্ট করে যে অর্থ ব্যয় করলাম, তা কোন কাজে লাগলো? ব্যবসা করার জন্য অর্থ প্রদান করে পিতা দেখতে থাকেন, তার সন্তান কতটা সফলতা অর্জন করলো বা ব্যর্থ হলো।

অর্থাৎ আমানত ও হিসাব-নিকাশের মধ্যে যেন একটি অনিবার্য যৌক্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের সীমিত জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা কোন অবস্থাতেও এ সম্পর্ক উপেক্ষা করতে পারে না। এই জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই মানুষ ইচ্ছাকৃত কর্ম ও অনিচ্ছাকৃত কর্মের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। আবারা ইচ্ছাকৃত কর্মের সাথে নৈতিক দায়-দায়িত্বের ধারণা ওতপ্রোতাভাবে জড়িত এবং তা কল্যাণ ও অকল্যাণের পার্থক্য নির্দেশ করে। কল্যাণমূলক কর্মের পরিসমাপ্তিতে সে প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করতে আগ্রহী হয় এবং অকল্যাণমূলক কর্মের শেষে উপযুক্ত প্রতিফল দাবি করে। এই উদ্দেশ্য সাধন করার লক্ষ্যে মানুষ আবহমান কাল থেকে পৃথিবীতে একটি প্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থাও রচিত করেছে।

সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎকর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করতে হবে–এই ধারণা যে আল্লাহ মানুষের মস্তিষ্কে দান করেছেন, স্বয়ং সেই আল্লাহ সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎকর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করার ধারণা হারিয়ে ফেলেছেন, এ কথা কি কোন নির্বোধেও বিশ্বাস করবে? বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলে পরিপূর্ণ সৃষ্টি এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু মানুষের অধীন করে দিয়েছেন, পৃথিবীর যাবতীয় উপায়-উপকরণ মানুষের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন–বিপুল ক্ষমতা লাভ করে মানুষ এসব কোন পন্থায় কিভাবে কোন কাজে ব্যবহার করলো, আল্লাহ এসব সম্পর্কে কোন হিসাব গ্রহণ করবেন না, এ কথা কি কোন সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে? সামান্য পূঁজি বিনিয়োগ করে মানুষ যদি বার বার হিসাব গ্রহণ করে, হিসাবে যদি দেখতে পায় যে, যার হাতে পূঁজি দেয়া হয়েছিল, সে সফলতা অর্জন করেছে। তখন তাকে পূঁজি বিনিয়োগকারী পুরস্কার দান করে। আর যদি হিসাব করে দেখে যে, বিনিয়োগকৃত পূঁজির অপব্যবহার করা হয়েছে, তখন তাকে শাস্তি প্রদান করে। এটা যদি মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে, তাহলে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহ মানুষের হাতে অর্পণ করার পরে তা কিভাবে মানুষ ব্যবহার করলো, এ সম্পর্কে তিনি কোন হিসাব গ্রহণ করবেন না, এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়?

আল্লাহ তা'য়ালা নিজের এতবড় বিশাল পৃথিবীর সাজ-সরঞ্জাম ও ব্যাপক ক্ষমতা সহকারে মানুষের হতে সোপর্দ করার পর তিনি হিসাব গ্রহণ করার কথা কি ভুলে গিয়েছেন? মানুষ অসৎ কর্ম সম্পাদন করে অর্থ আর প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে পৃথিবীর আইনের চোরাগলি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, কোন শাস্তি তাকে প্রদান করা যায়নি, কখনো কোনদিন তাকে এ ব্যাপারে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কোন আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে না, এ কথা কি মেনে নেয়া যায়? মানুষের চোখের সামনে পরিদৃশ্যমান যাবতীয় বস্তু এ কথারই সাক্ষী দিচ্ছে যে, সবকিছুর পরিসমাপ্তিতে আরেকটি জগৎ সৃষ্টি হতেই হবে এবং সেখানে মানুষের যাবতীয় কথা ও কর্ম সম্পর্কে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে। মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে ভুলে যায় যে, সে অতীতে কি করেছে। তার ভুলে যাওয়া কর্ম সম্পর্কে সেদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সূরা মুজাদালার ৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا-اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ-وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ-

সেদিন আল্লাহ তা'য়ালা এদের সবাইকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন এবং তারা যা কিছু করে এসেছে তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। তারা তো ভুলে গিয়েছে (নিজেদের কর্ম সম্পর্কে), কিন্তু আল্লাহ তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম গুণে গুণে সংরক্ষিত করেছেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সাক্ষী।

বিচার দিবসে মানুষ যা করেছে, তাই তার সামনে পেশ করা হবে। এ ব্যাপারে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে না। মানুষের কর্মই নির্ধারণ করবে তার ভবিষ্যৎ। তারই কর্মই তার জন্য স্থান নির্বাচন করবে। মানুষ নিজের হাতে যা উপার্জন করেছে, তার ভিত্তিতেই আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কাউকে তিনি অযথা অভিযুক্ত করবেন না। আল্লাহ বলেন–

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ-

এ হচ্ছে তোমার ভবিষ্যৎ, যা তোমার হাত তোমার জন্য প্রস্তুত করেছে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না। (সূরা আল হাজ্জ-১০)

মুহূর্তে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অগণিত সৃষ্টির মধ্যে এমন এক অদৃশ্য শক্তি যার নাম মধ্যকার্ষন-অভিকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করেছেন। যে শক্তি আমরা চোখে দেখতে পাই না

কিন্তু অনুভব করি। পৃথিবীর আকার আয়তন যত বড় তার চেয়েও আকার আয়তনে বড় ওই সূর্য, আবার যে সমস্ত তারকা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, তা ওই সূর্যের চেয়েও বড় আবার যে সমস্ত তারকার আলো এ পর্যন্ত পৃথিবীর এসে পৌছেনি, ওই সমস্ত তারকা আরো বড়। এক অদৃশ্য শক্তির কারণেই ওই সমস্ত তারকা, গ্রহ, নক্ষত্র যার যার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। কিয়ামতের দিন ওই অদৃশ্য শক্তি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিষ্ক্রিয় করে দেবেন। ফলে সমস্ত তারকা, গ্রহ, নক্ষত্র নিজের কক্ষচ্যুত হয়ে যাবে। সংঘর্ষ ঘটবে একটির সাথে অপরটির। ফলে সমস্ত কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। মধ্যাকর্ষণ শক্তি নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার ফলে পৃথিবীর সমস্ত কিছু তুলার মতো ভেসে বেড়াবে। তখন একটার সাথে আরেকটার সংঘর্ষ ঘটে বিকৃত হয়ে অবশেষে তা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। এ ঘটনা ঘটবে মুহূর্তের মধ্যে। কিয়ামত সংঘটিত হতে কতটুকু সময় লাগবে সে ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-وَمَااَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْهُوَاَقْرَبُ-اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

মহাধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হতে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না। শুধু এতটুকু সময় মাত্র লাগবে, যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে বা তার চেয়েও কম। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ সব কিছু করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (নাহ্ল-৭৭)

কোন প্রক্রিয়ায় সেই মহাধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا شَاءَ اللّٰهُ-

আর সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। সাথে সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা সমস্তই মরে পড়ে থাকবে। তবে আল্লাহ যাদের জীবিত রাখতে ইচ্ছুক তারা ব্যতীত। (সূরা যুমার-৬৮)

আখিরাতের জীবন পূর্ব নির্ধারিত

এই পৃথিবী যে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। সুদূর সপ্তম শতাব্দীতে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে এই পৃথিবী নির্দিষ্ট সময়ে ধ্বংস হবে, সে কথাটি

বিজ্ঞান নতুন করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং কিয়ামতের ব্যাপার যারা সন্দেহ করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ-لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ-

যখন সেই সংঘটিত হবার ঘটনাটি হয়েই যাবে, তখন তার সংঘটনের ব্যাপারে মিথ্যা বলার মতো কেউ থাকবে না। (সূরা ওয়াকিয়াহ্-১-২)

সমস্ত কিছুই মুহূর্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সেদিন, পার্থিব কোন কিছুই টিকে থাকবে না। শুধু টিকে থাকবে মহান আল্লাহর আরশে আযিম। তাঁর চিরঞ্জীব সত্তা ব্যতিত অন্য কোন কিছুই টিকে থাকবে না। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ -وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَلِ وَالاِكْرَامِ -

সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু টিকে থাকবে তোমার মহীয়ান-গরীয়ান রবের মহান সত্তা। (সূরা রাহ্মান-২৭)

সৃষ্টি জগতের ধ্বংস, নতুন জগত সৃষ্টি ও মানুষের পুনর্জীবন লাভ সবই আল্লাহর মহান পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর আওতাভুক্ত। মহাধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার জন্য ফেরেশতা হযরত ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম সিঙ্গা মুখের কাছে ধরে আরশে আজিমের দিকে আগ্রহে তাকিয়ে আছেন, কোন মুহূর্তে আল্লাহ আদেশ দান করবেন। ব্যাপারটা সহজে বুঝার জন্যে এভাবে ধারণা করা যায়, ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর আদেশে এক মহাশক্তিশালী সাইরেন বাজাবেন বা বংশী ধ্বনি করবেন। কোরআনে এই বংশীকে বলা হয়েছে 'সূর'। ইংরেজীতে যাকে 'বিউগল' বলা হয়। সে বংশী ধ্বনি এক মহাপ্রলয়ের মহা তান্ডবলীলার পূর্বাভাস। সেটা যে কি ধরণের বংশী এবং তার আওয়াজই বা কি ধরনের তা মানুষের কল্পনারও অতীত। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টা সহজ হয়ে যায়। যেমন বর্তমান কালে যুদ্ধের সময় সাইরেন বাজানো হয়। যুদ্ধকালীন সাইরেনের অর্থ হলো বিপদ-মহাবিপদ আসন্ন। মহাবিপদের সংকেত ধ্বনি হিসেবে যুদ্ধের সময় সাইরেন বাজানো হয়।

তেমনি কিয়ামত সংঘটিত হবার মুহূর্তে চরম ধ্বংস, আতংক ও বিভীষিকা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে–এটা জানানোর জন্যই সিংগায় ফুঁক বা সাইরেন বাজানো হবে। সিংগা থেকে ভয়ংকর শব্দ হতে থাকবে এবং বিরতিহীনভাবে এক ধরনের আতংক সৃষ্টিকারী আওয়াজ হতে থাকবে। সে শব্দে মানুষের কানের পর্দা ফেটে যাবে। সবাই একই গতিতে সেই বিকট শব্দ শুনতে পাবে। মনে হবে যেন তার কানের

কাছেই এই শব্দ হচ্ছে। ভয়ংকর সেই শব্দ কেউ একটু কম কেউ একটু বেশী শুনবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম কুদরতের মাধ্যমে সবার কানে সেই শব্দ একই গতিতে পৌঁছে দেবেন।

হাদীস শরীফে এই 'সূর' বা সিংগাকে তিন ধরনের বলা হয়েছে। নাফখাতুল ফিযা–অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্ত ও আংকতগ্রস্থ করার সিংগা ধ্বনী। নাফখাতুস সায়েক–অর্থাৎ মরে পড়ে যাওয়ার সিংগা ধ্বনী। নাফখাতুল কিয়াম–অর্থাৎ কবর হতে পুনর্জীবিত করে হাশরের ময়দানে সকলকে একত্র করার সিংগা ধ্বনী। অর্থাৎ হযরত ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম তিনবার সিংগায় ফুঁক দিবেন। প্রথমবার সিংগায় ফুঁক দেয়ার পরে এমন এক ভংকর প্রাকৃর্তিক বিশৃংখলা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে যে, মানুষ ও জীবজন্তু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উম্মাদের মতো ছুটাছুটি করবে। গর্ভিনীর গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবে। বাঘের পেটের নিচে ছাগল আশ্রয় লেবে কিন্তু বাঘের স্মরণ থাকবে না ছাগলকে ধরে খেতে হবে। অর্থাৎ এমন ধরনের ভয়ংকর সন্ত্রাসের সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়বার সিংগায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথেই যে যেখানে যে অবস্থায় থাকবে, সে অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে। তারপর কিছু সময় অতিবাহিত হবে। সে সময় কত বছর, কত মাস, কতদিন বা কত ঘন্টা হবে তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। এরপর তৃতীয়বার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। সাথে সাথে সমস্ত মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে। হাশরের ময়দানের বিশালতা কি ধরনের হবে তা আল্লাহ জানেন।

সেদিন আকাশ ও যমীনকে পরিবর্তন করে দেয়া হবে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَوْمَ تُبَدَّلُ الاَرْضُ غَيْرَ الاَرْضِ وَالسَّموَاتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ–وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الاَصْفَادِ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ–لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ–اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ–

(তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও) যেদিন যমিন আসমানকে পরিবর্তন করে অন্যরূপ দেয়া হবে। তারপর সকলেই মহাপরাক্রান্তশালী এক আল্লাহর সামনে হাতে পায়ে শিকল পরা এবং আরামহীন অবস্থায় হাজির হয়ে যাবে। সেদিন তোমরা

পাপীদেরকে দেখবে আলকাতরার পোষাক পরিধান করে আছে আর আগুনের লেলিহান শিখা তাদের মুখমন্ডলের উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। এটা এ জন্যে হবে যে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেবেন। আল্লাহর হিসাব গ্রহণ করতে বিলম্ব হয় না। (সূরা ইবরাহীম-৪৮-৫১)

গভীরভাবে কোরআন হাদীস অধ্যায়ন করলে অনুমান করা যায় যে, কিয়ামতের দিন বর্তমানের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার অবসান ঘটিয়ে নতুন একজগত মহান আল্লাহ প্রস্তুত করবেন। সে জগতের নামই পরকাল বা পরজগত। সে জগতের জন্যেও নিয়ম কানুন রচনা করা হবে। তারপর তৃতীয়বার সিংগায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারী সমস্ত মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। এই উপস্থিত হওয়াকেই কোরআনে হাশর বলা হয়েছে। হাশর শব্দের অর্থ হলো চারদিক থেকে গুটিয়ে একস্থানে সমাবেশ করা।

পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেয়া হবে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন−

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا-

পৃথিবীটা তখন হঠাৎ করেই কাঁপিয়ে দেয়া হবে। (সূরা ওয়াকিয়াহ্-৪)

কিয়ামতের দিন প্রচন্ড ভূমিকম্প হবে। এ ভূমিকম্পের কম্পনের মাত্রা যে কত ভয়ংকর হবে তা অনুমান করা কঠিন। পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোন এলাকায় ভূমিকম্প হবে না, বরং গোটা পৃথিবী জুড়ে একই সময়ে হবে। হঠাৎ করেই পৃথিবীটাকে ধাক্কা দেয়া হবে। ফলে পৃথিবী ভয়াবহভাবে কাঁপতে থাকবে। সেদিন মহাশূন্যে পাহাড় উড়বে। আল কোরআন ঘোষণা করছে, পৃথিবী সৃষ্টির পরে তা কাঁপতে থাকে, পরে পাহাড় সৃষ্টি করে মধ্যাকর্ষণ শক্তিদ্বারা পেরেকের ন্যায় পৃথিবীতে বসিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবী তখন স্থির হয়। কিন্তু কিয়ামতের দিন মধ্যাকর্ষণ শক্তি আল্লাহ উঠিয়ে নেবেন। ফলে পাহাড়সমূহ উড়তে থাকবে অর্থাৎ মহাশূন্যে ভেসে বেড়াবে।

পাহাড়সমূহ মহাশূন্যে ভেসে বেড়াবে

সূরা নাবা-এর ২০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন−

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ-

পাহাড় চালিয়ে দেয়া হবে। অবশেষে তা কেবল মরিচিকায় পরিণত হবে।

মহাশূন্যে বিক্ষিপ্তভাবে পাহাড়সমূহ চলতে থাকবে। ফলে একটার সাথে আরেকটির ধাক্কা লেগে ধ্বংসের এক বিভিষীকা সৃষ্টি হবে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا–

আর মানুষ আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি জানিয়ে দিন আমার রব্ব তা সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দিবেন। (সূরা ত্ব-হা-১০৫)

পাহাড় বলতে মানুষ অনুমান করে এমন একবস্তু যা কোন দিন হয়ত ধ্বংস হবে না। মানুষ কোন বিষয়ের স্থিরতা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পাহাড়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে কথা বলে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ–

আজ তুমি পাহাড় দেখে মনে করছো যে এটা বোধহয় অত্যন্ত দৃঢ়মূল হয়ে আছে, কিন্তু সেদিন তা মেঘের মতোই উড়তে থাকবে। (সূরা নামল-৮৮)

পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যার যার স্থানে স্থির রয়েছে–আল্লাহর সৃষ্টি বিশেষ এক আকর্ষণী শক্তির কারণে। সেদিন এসব আকর্ষণী শক্তি আল্লাহর আদেশে অকেজো হয়ে পড়বে। ফলে পাহাড়গুলো যমীনের ওপরে আছাড়ে পড়তে থাকবে এবং তার অবস্থা কেমন হবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا–

পাহাড়গুলো রংবেরংয়ের ধুনা পশমের মতো হয়ে যাবে। (সূরা মায়ারিজ-৯)

পৃথিবীর পাহাড়সমূহকে শূন্যে উঠিয়ে তা আবার যমীনের বুকে আছ্ড়ে ফেলা হবে। ফলে তা প্যাঁজা ধুনা তুলার মতো করে-বালির মতো করে মহাশূন্যে উড়িয়ে দেয়া হবে। পৃথিবীতে কোথায় কোনদিন পাহাড় ছিল, এ কথা কল্পনাও করা যাবে না।

পাহাড়সমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে

সূরা কারিয়ায় বলা হয়েছে–

اَلْقَارِعَةُ مَاالْقَارِعَةُ–وَمَااَدْرَاكَ مَاالْقَارِعَةُ–يَوْمَيَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ–وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَاالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ–

ভয়াবহ দূর্ঘটনা! কী সেই ভয়াবহ দূর্ঘটনা? তুমি কি জানো সেই ভয়াবহ দূর্ঘটনা কি? সেদিন যখন মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার মতো এবং পাহাড়সমূহ রংবেরংয়ের ধুনা পশমের মতো হবে।

পৃথিবীর সমস্ত পর্বত একই ধরনের নয়। সব পর্বতের রং ও বর্ণও এক নয়। কোনটা লাল কোনটা কালো আবার কোনটা শুধু বরফের। পশম যেহেতু বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে সে হেতু পশমের সাথে আল্লাহ তুলনা দিয়েছেন। পশম বাতাসে উড়ে। পাহাড়সমূহও কিয়ামতের দিন পশমের মতো উড়তে থাকবে। শুধু তাই নয়, সেদিন ওই বিশাল পর্বতমালা শুন্যে উঠিয়ে মাটির উপর প্রচন্ড বেগে আছাড় দেয়া হবে। মহান আল্লাহ সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে বলেন–

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً-فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ-

পৃথিবী ও পর্বতসমূহকে শুন্যে প্রচন্ড আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন সেই সংঘটিতব্য ঘটনা ঘটবেই। (সূরা হাক্কাহ্-১৪-১৫)

পাহাড়সমূহ মরিচীকার ন্যায় অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে

পাহাড়সমূহ কিয়ামতের দিন মরিচীকার ন্যায় অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। যেখানে পাহাড়সমূহ স্থির অটলভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কোন চিহ্নই থাকবে না। কোরআন বলছে–

وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا-فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا-

পাহাড়সমূহকে এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে যে, তা শুধু বিক্ষিপ্ত ধুলিকনায় পরিণত হবে। (সূরা ওয়াকিয়া-৫-৬)

মহাশূন্যের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্রমালা, তারকামন্ডলী জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সমস্ত কিছুর আলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। উর্ধ্বজগতের সে সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার কারণে প্রতিটি তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহসমূহ নিজ নিজ কক্ষ পথে অবিচল হয়ে রয়েছে এবং যে কারণে বিশ্বলোকের প্রতিটি জিনিস নিজ নিজ সীমার মধ্যে আটক হয়ে আছে, তা সবই চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়া হবে। যাবতীয় বন্ধান সেদিন শিথিল করে দেয়া হবে। সূরা মুরসালাতে বলা হয়েছে–

فَاذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ-وَاذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ

এরপর যখন নক্ষত্রমালা ম্লান হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হবে। তখন পাহাড়-পর্বত চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। (সূরা মুরসালাত-৮-১০)

কিয়ামতের দিন ওই বিশাল পাহাড়ের অবস্থা যখন ধূলিকণায় পরিণত হবে, তখন মানুষের অবস্থা যে কি ধরনের হবে তা কল্পনা করলেও শরীর শিহরিত হয়। শূন্যে

ভাসমান পাহাড়কে জমিনের উপরে আছড়ানো হবে। ভাসমান অবস্থায় একটার সাথে আরেকটার সংঘর্ষ ঘটতে থাকবে, ফলে গোটা পৃথিবী জুড়ে এক ভয়াবহ বিভীষিকার সৃষ্টি হবে।

আকাশ-মন্ডল ধোঁয়া নিয়ে আসবে

সূরা দুখান-এ মহান আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলেন–

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ-يَّغْشَى النَّاسَ-هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

তোমরা অপেক্ষা করো সেই দিনের যখন আকাশ-মন্ডল সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে। তা মানুষদের উপর আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এটা হলো পীড়াদায়ক আযাব।

আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে

সেদিন আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। অসংখ্য তারকামালা খচিত সৌন্দর্য-মন্ডিত আসমান বর্তমান অবস্থায় থাকবেনা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ-

যখন আকাশ-মন্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। (সূরা ইনফিতার-১)

সেদিন এমন ভায়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করা হবে যে, ভয়ে-আতঙ্কে, দুশ্চিন্তায় অল্প বয়স্ক বালকগুলোকে বৃদ্ধের ন্যায় দেখা যাবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا-السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِه-كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلاً-

তাহলে সেদিন কিভাবে রক্ষা পাবে যেদিন বালকদেরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেয়া হবে। এবং যার কঠোরতায় আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আর ওয়াদা তো অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। (সূরা মুয্যাম্মিল-১৭-১৮)

অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়ংকর ঘটনা যে ঘটবে–আল্লাহ বারবার তা বলেছেন। সুতরাং, আল্লাহ যা বলেন তা অবশ্যই হবে। আসমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে-পৃথিবীর মাটি ওলট–পালট হতে থাকবে। ফলে মাটির নিচে যা কিছু আছে, কিয়ামতের দিন মাটি তা উদগিরণ করে দেবে।

আকাশ মন্ডল ফেটে যাবে

আল্লাহ রব্বুল আলামী বলেন–

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ-وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ-وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ-وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ-

যখন আকাশ মন্ডল ফেটে যাবে এবং নিজের রবের নির্দেশ পালন করবে, আর তার জন্যে এটাই যথার্থ। যখন মাটিকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার গর্ভে যা কিছু আছে, তা সব বাইরে নিক্ষেপ করে মাটি শূন্য হয়ে যাবে। (সূরা ইনশিকাক-১-৪)

সেদিন আকাশ মন্ডল ভয়ংকরভাবে কাঁপতে থাকবে। কিয়ামতের দিন উর্ধ্বলোকের সমস্ত শৃংখলা ব্যবস্থা চুরমার হয়ে যাবে। তখন আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মনে হবে, যে জমাট-বাঁধা দৃশ্য চিরকাল একই রকম দেখাতো–একইরূপ অবস্থা বিরাজমান মনে হতো, তা ভেঙে-চুরে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে আর চারদিকে একটা প্রলয় ও অস্থিরতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধরিত্রীর যে শক্ত পাঞ্জা পর্বতগুলোকে অবিচল করে রেখেছিল, তা শিথিল হয়ে যাবে। পর্বতগুলো নিজের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন ও উৎপাটিত হয়ে মহাশূন্যে এমনভাবে উড়তে থাকবে, যেমন আকাশে মেঘমালা উড়ে। পবিত্র কোরআনে ঘোষনা করা হয়েছে–

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا-وَتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا-

সেদিন আসমান থর থর করে কাঁপতে থাকবে। আর পর্বতসমূহ শূন্যে উড়ে বেড়াবে। (সূরা তুর-৯-১০)

কিয়ামতের দিন কোন বস্তুই তার নির্দিষ্ট স্থানে থাকবে না। প্রতিটি বস্তু সেদিন নিজের স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে দ্রুত গতিতে ছুটাছুটি করতে থাকবে। ফলে একটার সাথে আরেকটার সংঘর্ষ ঘটে সব কিছু প্রকম্পিত হয়ে উঠবে। আকাশ মন্ডল এমনভাবে কাঁপতে থাকবে যেমনভাবে প্রচন্ড ঝড়ে বৃক্ষ তরুলতা কাঁপে। (কত জোরে কাঁপবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। সাধারণভাবে বুঝার জন্য ঝড় এবং বৃক্ষ তরুলতার উদাহরণ দেয়া হলো।) তাবিজ বানানোর পূর্বে পাত বানোনো হয়। পরে পাত গুটিয়ে তাবিজ বানানো হয়। সেদিন আকাশের সেই অবস্থা হবে। কোন বই-পুস্তকের বন্ধন শিথিল করে প্রবল বাতাসের সামনে মেলে ধরলে যেমন একটির পর আরেকটি পৃষ্ঠা উড়তে থাকে, সেদিন আকাশমন্ডলী তেমনিভাবে উড়তে থাকবে। আকাশকে এমনভাবে গুটিয়ে নেয়া হবে, কাগজকে গুটিয়ে যেভাবে বান্ডিল বাঁধা হয়।

আকাশকে গুটিয়ে ফেলা হবে

মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ-كَمَابَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ-وَعْدًا عَلَيْنَا-انَّا كُنَّافَاعِلِيْنَ-

সেদিন, যখন আকাশকে আমি এমনভাবে গুটিয়ে ফেলবো যেমন বান্ডিলের মধ্যে গুটিয়ে রাখায় হয় লিখিত কাগজ। যেভাবে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, অনুরূপভাবে আমরা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবো। এটা একটা ওয়াদা বিশেষ যা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমার। এটা আবশ্যই আমি করবো। (সূরা আম্বিয়া-১০৪)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, চূড়ান্ত বিচারের দিন একটি পূর্ব নির্দিষ্ট দিন। সেদিন সিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে। আর আকাশমন্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, ফলে তা কেবল দুয়ার আর দুয়ারে পরিণত হবে। পাহাড় চালিয়ে দেয়া হবে, পরিণামে তা নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে। মহান আল্লাহ যতগুলো আকাশ সৃষ্টি করেছেন, তা একটির পর আরেকটি উন্মুক্ত হতে থাকবে।

আসমানসমূহ গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে

কোরআনের অন্যস্থানে আকাশ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ-

সেদিন আসমানসমূহ গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। (সূরা মায়ারিজ-৮)

কিয়ামতের দিন এমন অবস্থা হবে যে, যে ব্যক্তিই তখন আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে শুধু আগুনের ন্যায় দেখতে পাবে। গলিত তামা যেমন অগ্নিকুন্ডে রক্তবর্ণ ধারণ করে টগবগ করে ফুটতে থাকে, সেদিন মহাশূন্যলোক তেমনি আগুনের রূপ ধারণ করবে। সূরা রাহমানের ৩৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ-

যখন আকাশ মন্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তা রক্তিমবর্ণ ধারণ করবে।

আকাশ মন্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে

সেদিন আকাশ মন্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে অর্থাৎ উর্ধ্বজগতে কোনরূপ আড়াল বা বাধা প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব থাকবেনা, যেন বর্ষনের সমস্ত দরোজা খুলে দেয়া

হয়েছে, গযব আসার কোন দরোজাই আর বন্ধ নেই। উর্ধ্বজগতে প্রতি মুহূর্তে বিশাল বিশাল উল্কাপাত হচ্ছে। যে উল্কা কোন দেশের উপর পড়লে সে দেশ মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ মধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং উর্ধ্বে শূন্যলোকে এমন অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে ওই সমস্ত উল্কা পৃথিবীর মানুষের উপর পতিত না হয়। মাঝে মধ্যে দু'একটি উল্কা পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌছে, কিন্তু সেটাও মরুপ্রান্তরে পতিত হয়। কোন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পতিত হয় না। সূরা আন্ নাবা-এর ১৯-২০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

وَّفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًاوَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا

আকাশ মন্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। ফলে তা দুয়ার আর দুয়ার হয়ে যাবে। পাহাড়কে চলমান করে দেয়া হবে। পরিণামে তা শুধু মরিচিকায় পরিণত হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে এই পৃথিবী ক্রমশঃ এক মহাধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ পৃথিবীও একদিন মৃত্যুবরণ করবে। চন্দ্র, সূর্য, তারকা, গ্রহ-নক্ষত্র সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ এ সমস্ত কথা পৃথিবীর মানুষকে বহু শতাব্দী পূর্বে মহাগ্রন্থ আল কোরআন জানিয়ে দিয়েছে।

চন্দ্র আলোহীন হয়ে যাবে

পবিত্র কোরআনের সূরা কিয়ামাহ্-এর ৮-১০ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

فَاِذَابَرِقَ الْبَصَرُ–وَخَسَفَ الْقَمَرُ–وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ–يَقُوْلُ الاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ–كَلاَّ لاَ وَزَرَ–اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ–

দৃষ্টিশক্তি যখন প্রস্তরীভূত হয়ে যাবে এবং চন্দ্র আলোহীন হয়ে যাবে এবং সূর্যকে মিলিয়ে একাকার করে দেয়া হবে। তখন মানুষ (সন্ত্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করে) বলবে কোথায় পালাবো? কখনো নয়, সেদিন তারা পালানোর জায়গা পাবে না। সেদিন সবাই তোমার রবের সামনে অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

চন্দ্রের আলোই শুধু নিঃশেষ হবে যাবে না, চন্দ্রের আলোর মূল উৎস স্বয়ং সূর্যও জ্যোতিহীন ও অন্ধকারময় হয়ে যাবে। ফলে আলো ও জ্যোতিহীনতা উভয়ই সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন এই পৃথিবী অকস্মাৎ বিপরীত দিকে চলতে শুরু করবে ফলে সেদিন চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই একই সময় পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। চন্দ্র আকস্মিকভাবে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ও

সূর্যের গহ্বরে নিপতিত হবে। মহাশূন্যে যে সর্বভূক ব্লাকহোল সৃষ্টি করা হয়েছে, এই ব্লাকহোলের মধ্যে সমস্ত কিছু হারিয়ে যাবে।

সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে

পবিত্র কোরআনের সূরা আত্ তাকভীর-এর ১-২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ-وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ-

যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে এবং নক্ষত্ররাজি আলোহীন হয়ে যাবে।

কোন বস্তুকে প্যাঁচানো বা গুটানোকে আরবী ভাষায় "তাকভির" বলা হয়। যেহেতু কিয়ামতের দিন সূর্যকে আলোহীন করা হবে সে কারণে রূপকভাবে বলা হয়েছে সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে। অর্থাৎ সূর্যের আলোকে গুটিয়ে ফেলা হবে। সমস্ত নক্ষত্রমালা জ্যোতিহীন হয়ে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলোয় চন্দ্র উজ্জ্বল দেখায়। সুতরাং সূর্যের আলো ছিনিয়ে নেয়ার পরে চন্দ্র আর আলোকিত দেখাবে না। চন্দ্র আর সূর্য বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকবে। ফলে সূর্য পশ্চিম দিকে দেখা যাবে। এমনটিও হতে পারে চন্দ্র হঠাৎ করেই পৃথিবীর মধ্যাকর্ষন শক্তি হতে বন্ধনমুক্ত হয়ে সূর্যের কক্ষপথে গিয়ে পড়বে। ফলে চন্দ্র, সূর্য মিলে একাকার হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন কোন কিছুই সুশৃংখলভাবে নিজ অবস্থানে থাকতে পারবে না। সমস্ত বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলায় মিশে যাবে।

নদী-সমুদ্রকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে

নদী-সমুদ্র ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ-

যখন নদী-সমুদ্রকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে। (সূরা ইনফিতার-৩)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিয়ামতের সময় গোটা পৃথিবী জুড়ে জলে–স্থলে এবং অন্তরীক্ষে এক মহাকম্পন সৃষ্টি করা হবে। ঐ কম্পনের ফলে নদী এবং সমুদ্রের তলদেশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পানি বলতে কোন কিছুই নদী-সমুদ্রে অবশিষ্ট থাকবে না।

নদী–সমুদ্র আগুনে পরিণত হবে

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলেন–

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ-

এবং যখন নদী–সমুদ্র আগুনে পরিণত হবে। (সূরা আত-তাকভীর-৬)

কিয়ামতের দিন পানি পূর্ণ নদী ও অগাধ জলধী-সমুদ্রে, মহাসাগরে আগুন জ্বলতে থাকবে। কথাটা অনেকের কাছে নতুন অবিশ্বাস্য দুর্বোধ্য ও আশ্চর্যজনক মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞান যাদের পড়া আছে সেই সাথে পানির মূল উপাদান সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে, তাদের কাছে ব্যাপারটা নতুন কিছু নয় এবং অবিশ্বাস্য তো নয়ই। আল্লাহর অসীম কুদরতের বলে পানি হচ্ছে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক দু'টো গ্যাসের মিশ্রণ। হাইড্রোজেন দাহ্য, এই গ্যাস নিজে জ্বলে। আর অক্সিজেন জ্বলতে সাহায্য করে। পানি অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রন হলেও আল্লাহর অসীম কুদরত যে, পানিই আগুন নেভায়। পানি-আগুনের শত্রু। আবার পানির অপর নাম জীবন। এক আয়াতে কোরআন বলছে নদী, সমুদ্র কিয়ামতের সময় আগুনে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। অপর আয়াত বলছে, সেদিন নদী ও সমুদ্র দীর্ণ-বিদীণ হয়ে যাবে। এখানে দু'টো ব্যাপার. (এক) আগুনে পরিপূর্ণ হবে নদী ও সমুদ্র। (দুই) নদী, সমুদ্র, দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে। দু'টো বিষয়কে সামনে রাখলে নদী, সমুদ্রে আগুন জ্বলার বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান বলছে এবং টিভির মাধ্যমে মানুষকে দেখাচ্ছেও মহাসাগরের অতল তলদেশে আগ্নেয়গিরি আছে। সেখান থেকে উত্তপ্ত লাভা নির্গত হচ্ছে। কিয়ামতের সময় প্রচণ্ড কম্পনের ফলে নদী ও সমুদ্রের তলদেশ ফেটে সমস্ত পানি এমন এক স্থানে গিয়ে পৌছবে, যেখানে প্রতি মুহূর্তে এক কঠিন উত্তপ্ত লাভা টগবগ করে ফুটছে ও আলোড়িত হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশের এই স্তরে পানি পৌছে পানির দু'টো মৌল উপাদানে-হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিভক্ত হয়ে যাবে। অক্সিজেন প্রজ্জ্বালক ও হাইড্রোজেন উৎক্ষেপক। তখন এভাবে বিশ্লেষিত হওয়া এবং অগ্নি উদগীরণ হওয়ার এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। এভাবেই পৃথিবীর নদী ও সমুদ্র কিয়ামতের সময় আগুনে পরিপূর্ণ হবে। সমস্ত প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হবে, সে বিষয়ে মানুষের সঠিক জ্ঞান নেই, প্রকৃত বিষয় আল্লাহই ভালো জানেন।

তবে মানুষ যদি সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে সামান্য ধারনা লাভ করতে চায়, তাহলে বিভিন্ন আগ্নেয়গিরি থেকে ধারণা লাভ করতে পারে।এমন অনেক আগ্নেয়গিরি রয়েছে, যাদের অবস্থান মহাসমুদ্রের গভীরে অথবা সমুদ্র নিকটবর্তী। সমুদ্রের পানির প্রচন্ড চাপকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে রক্তিমবর্ণ উত্তপ্ত লাভা তীব্র বেগে ছুটতে থাকে। পানির ভেতর দিয়ে লাভা যে পথে অগ্রসর হয়, চারদিকের পানি উত্তপ্ত লাভা শোষণ করতে থাকে বা বাষ্পাকারে উড়ে যায়। পানির ভেতরেও তপ্ত লাভা টগবগ করে ফুটতে থাকে।

আতঙ্কে মানুষ দিশাহারা হয়ে যাবে

সেদিন ভয়ে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটবে। মায়ের কাছে সন্তান সবচেয়ে প্রিয়। সন্তানের জন্য মা প্রয়োজনে নিজের জীবনও দান করতে পারে। কিন্তু কিয়ামতের সময় যে ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হবে, তা দেখে মা সন্তানের কথা ভুলে যাবে। পৃথিবীতে ভূমিকম্প পূর্বাভাস দিয়ে সংঘটিত হয় না। মাত্র কিছু দিন পূর্বে তুরুস্কে এবং ভারতের গুজরাটের ভূজ শহরে যে ভূমিকম্প হয়ে গেল, সেখানে মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় নিয়োজিত ছিল। কেউ আহারে, ভ্রমণে, সাংসারিক উপকরণ যোগানের কাজে, কেউ গান-বাজনায়-নৃত্যে, কেউ বা অবৈধভাবে যৌন সম্ভোগে নিয়োজিত ছিল। ভূমিকম্পে তুরুস্কে যেসব নামি-দামী হোটেল, তথাকথিত আধুনিকতার দাবিদারদের আবাসস্থল ধ্বংস হয়েছিল, সেসব ধ্বংসাবশেষ থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের সময় এমন সব নারী-পুরুষের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যারা অবৈধভাবে যৌন সম্ভোগে নিয়োজিত ছিল। যে মুহূর্তে তারা কিয়ামত, বিচার দিবসের কথা ভুলে আল্লাহর বিধান অমান্য করে কুকর্মে নিয়োজিত ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ভূমিকম্পের কবলে তারা পড়েছিল। কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই অবগত আছেন। মানুষ সে সময়ে নানা ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকবে। মাতৃস্তন সন্তান মুখে নিয়ে চুষতে থাকবে, সেই মুহূর্তেই মহাধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে। মায়েরা নিজেদের শিশু সন্তানদেরকে দুধ পান করানো অবস্থায় ফেলে দিয়ে পালাতে থাকবে এবং নিজের কলিজার টুকরার কি অবস্থা হলো, তা কোন মায়ের মনে থাকবে না।

স্তনদানরত মা সন্তান রেখে পালিয়ে যাবে

মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা হজ্জ-এর ২ নং আয়াতে বলেন-

يَاَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ-يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّااَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَاوَتَرَى النَّاسَ سُكرى وَمَاهُمْ بِسُكْرى وَلكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ-

হে মানুষ! তোমাদের রব-এর গযব থেকে বাঁচো। আসলে কিয়ামতের প্রকম্পন বড়ই ভয়ঙ্কর জিনিস। সেদিনের অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক স্তন দানকারিনী

(ভীতগ্রস্থ হয়ে) নিজের স্তনদানরত সন্তান রেখে পালিয়ে যাবে। ভয়ে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটে যাবে। তখন মানুষদের তুমি দেখতে পাবে মাতালের মতো, কিন্তু তারা কেউ নেশাগ্রস্থ হবে না। আল্লাহর আযাব অত্যন্ত ভয়ংকর হবে।

মানুষ নেশাগ্রস্থের মতো আচরণ করতে থাকবে

কিয়ামতের দিন মানুষ নেশাগ্রস্থের মতো আচরণ করতে থাকবে। মদপান না করেও ভয়ে আতঙ্কে মানুষ মাতালের মতো হবে। মানুষের তাকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হবে যেন চোখের তারা কোটর ছেড়ে ছিট্‌কে বের হয়ে যাবে। চোখের পলক ফেলতেও মানুষের মনে থাকবে না। ভয়ে আতঙ্কে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকবে, মনে হবে যেন পাথরের চোখ। মহান রাব্বুল আলামীন সূরা ইবরাহীমে বলেন–

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ–اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الاَبْصَارُ–مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ–وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ–

আল্লাহ তো তাদেরকে ক্রমশঃ নিয়ে যাচ্ছেন সে দিনটির দিকে, যখন চোখগুলো দিকভ্রান্ত হয়ে যাবে। আপন মস্তকসমূহ উর্ধ্বমুখী করে রাখবে। তাদের দৃষ্টি আর তাদের দিকে ফিরে আসবে না এবং ভয়ে তাদের অন্তরসমূহ উড়ে যাবে।

প্রাণ ভয়ে উষ্ঠাগত হবে

ভয়ে আতঙ্কে মানুষের বুকের কলিজা কণ্ঠনালীর কাছে চলে আসবে। পবিত্র কোরআনের সূরা নাযিয়াতে বলা হয়েছে–

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ–

তাদের দৃষ্টিসমূহ তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। (সূরা নাযিয়াত-৯)

সূরা কিয়ামাহ্ বলছে, 'তখন তাদের দৃষ্টি সমূহ প্রস্তরীভূত হয়ে যাবে।' সেদিন মানুষ ওই ভয়ংকর অবস্থা এমন ভীত সংকিত, বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে দেখতে থাকবে যে, নিজের শরীরের দিকে তাকানোর কথা সে ভুলে যাবে। কিয়ামতের দিন মানুষ এমন কাতরভাবে তাকাবে, দেখে মনে হবে মানুষের চোখগুলোয় বুঝি প্রাণ নেই–পাথরের নির্মিত চোখ। সবার দৃষ্টি বিষ্ফোরিত হয়ে যাবে। সূরা মু'মিনের ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ–

হে নবী, ভয় দেখাও এ মানুষদেরকে সেদিন সম্পর্কে, যা খুব সহসাই এসে পড়বে। যখন প্রাণ ভয়ে উষ্ঠাগত হবে এবং মানুষ নীরবে ক্রোধ হজম করে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে।

কম্পনের পর কম্পন আসতে থাকবে

আল-কোরআন জানাচ্ছে–

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ-تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ-قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ-

যেদিন ধাক্কা দিবে মহাকম্পনের একটি কম্পন, তারপর আরেকটি ধাক্কা, মানুষের অন্তরসমূহ সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে। (সূরা নাযিয়াত-৬-৮)

সেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে দেবে

মানুষ যখন চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয় তখন তাকে দেখে অনেকেই মন্তব্য করে, মানুষটিকে চিন্তায় বুড়ো মানুষের মতো দেখাচ্ছে। এর অর্থ হলো মানুষটি ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্থ। এ ধরনের উদাহরণ দিয়েই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলেন–

كَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا-السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ-كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلاً-

সেদিন কেমন করে রক্ষা পাবে যেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে দেবে এবং যার কঠোরতায় আসমান দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। (সূরা মুয্যাম্মিল-১৭-১৮)

মানুষ ভয়ে মাতা-পিতা ও স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে পালিয়ে যাবে

কি ধরনের বিপদে পড়লে মানুষ নিজ সন্তান-প্রাণের প্রিয়জনকে ছেড়ে পালায় তা কল্পনাও করা যায় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় উঠবে। রাসূলের স্ত্রীদের একজন (কোন বর্ণনানুযায়ী হযরত আয়িশা, কোন বর্ণনানুসারে হযরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা আবার কোন বর্ণনাকারীর মতে অন্য একজন নারী) আতঙ্কিত হয়ে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের গোপন অঙ্গসমূহ সেদিন সবার সামনে অনাবৃত ও উন্মুক্ত হবে ? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর রাসূল কোরআন থেকে জানিয়ে দিলেন, সেদিন কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়ার মতো সচেতনতা কারো থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ-يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ-وَاُمِّهٖ

وَأَبِيهِ-وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ-لِكُلِّ امْرِئٍ-مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ-شَأْنٌ يُغْنِيهِ-وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ-وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَاغَبَرَةٌ-تَرْهَقُهَاقَتَرَةٌ-

সবশেষে যখন সেই কান বধিরকারী ধ্বনি উচ্চারিত হবে। সেদিন মানুষ তার নিজের ভাই, মাতা-পিতা ও স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। তাদের প্রত্যেকের উপর সেদিন এমন একটি সময় (ভয়ংকর ও বিভীষিকাপূর্ণ সময়) এসে পড়বে যখন নিজকে ছাড়া (নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা ছাড়া) আর কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অবকাশ থাকবে না। সেদিন কতিপয় মুখমন্ডল আনন্দে উজ্জ্বল থাকবে, হাসি-খুশী ভরা ও সন্তুষ্ট-স্বচ্ছন্দ হবে। আবার কতিপয় মুখমন্ডল ধুলি মলিন হবে। অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হবে। (সূরা আবাসা-৩৩-৪১)

কোন স্নেহদাতা পিতা ও স্নেহময়ী মাতা যদি ফাঁসির আসামী হয় এবং কোন সন্তানকে মঞ্চে উঠিয়ে প্রস্তাব দেয়া হয়, 'তোমাকে মুক্তি দিয়ে যদি তোমার কোন সন্তানকে ফাঁসি দেয়া হয়, তাতে তুমি রাজী আছো কিনা?' পৃথিবীর কোন পিতা-মাতাই বোধহয় এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেনা, নিজে ফাঁসিতে ঝুলবে কিন্তু সন্তানের মৃত্যু সে কামনা করবে না। পৃথিবীতে রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য, অর্থ-সম্পদ নিজের দখলে নেয়ার লক্ষ্যে কত মামলা মোকদ্দমা, একজন সুন্দরী মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে লাভের জন্য কত চেষ্টা। কিন্তু কিয়ামতের দিন! সেদিন বিপদের ভয়াবহতা দেখে মানুষ গোটা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে হলেও নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করবে। পরিচিত-আপনজনদের অবস্থা যে কি, তা জানারও চেষ্টা করবেনা। নিজের চিন্তা ছাড়া সে আর কারো চিন্তা করবে না।

আত্মীয়তার বন্ধন কোনই কাজে আসবে না

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেন–

وَلَايَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا-يُّبَصَّرُونَهُمْ-يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ-وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ-وَفَصِيلَتِهِ الَّتِىْ تُئْوِيهِ-وَمَنْ فِى الاَرْضِ جَمِيعًا-ثُمَّ يُنْجِيهِ-

সেদিন কোন প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুকেও প্রশ্ন করবে না। অথচ তাদের পরস্পর দেখা হবে। অপরাধীগণ সেদিনের আযাব হতে মুক্তি পাবার জন্য নিজের

সন্তান, স্ত্রী, ভাই, তাকে আশ্রয়দানকারী অত্যন্ত কাছের পরিবারকে এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বিনিময় দিয়ে হলেও মুক্তি পেতে চাইবে। (সূরা মায়ারিজ-১০-১৪)

কিয়ামতের দিন পৃথিবীর সব রকমের আত্মীয়তা, সম্পর্ক-বন্ধন ও যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন হয়ে যাবে। দল, বাহিনী, বংশ, গোত্র, পরিবার ও গোষ্ঠী হিসেবে সেদিন হিসাব নেয়া হবে না। এক এক ব্যক্তি একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই সেদিন হিসাব দেবে। সুতরাং আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, স্ত্রী-সন্তান ও নিজ দলের খাতিরে কোন ক্রমেই অন্যায় কর্মে লিপ্ত হওয়া বা অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা, ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করা উচিত নয়। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতদেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সাথে অসহযোগিতা করলে নিশ্চিত জাহান্নামে যেতে হবে। কারণ সেদিন নিজের কৃতকর্মের দায়-দায়িত্ব নিজেকেই বহন করতে হবে। দল, আত্মীয়তা, স্ত্রী-সন্তান কোন উপকারেই আসবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ-يَوْمَ الْقِيمَةِ-

কিয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক, তোমাদের কোন কাজে আসবে, না তোমাদের সন্তান-সন্তুতি। (সূরা মুমতাহিনা-৩)

তবে হ্যাঁ, কোন মানুষ যদি নিজের স্ত্রী-সন্তানকে ইসলাম শিক্ষা দেয়, ইসলামী বিধান মেনে চলার ব্যাপারে সহযোগিতা করে, আল্লাহ চাইলে তারা উপকারে আসতেও পারে। সেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না।, কারো কোন ক্ষমতাও থাকবে না। পৃথিবীর রাজা, বাদশাহ্, ক্ষমতাসীন দল, ক্ষমতাবান মানুষ কত অত্যাচার করে দুর্বলদের ওপর। ভুলে যায় কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন জলদ গম্ভীর স্বরে ডাক দিয়ে বলবেন, আজ কোথায় পৃথিবীর সেই রাজা, বাদশাহগণ? কোথায় সেই অত্যাচারীগণ?'

সেদিন বাদশাহী হবে একমাত্র আল্লাহর

পবিত্র কোরআনের সূরা মুমিন-এর ১৬-১৭ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে-

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ-لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ-اَلْيَوْ تُجْزَاى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ-لاَظُلْمَ الْيَوْمَ-اِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

(আখিরাতের দিন উচ্চস্বরে করে প্রশ্ন করা হবে) আজ বাদশাহী কার? (পৃথিবীর ক্ষমতাগর্বী শাসকগণ আজ কোথায়?) (উত্তরে বলা হবে) আজ বাদশাহী কর্তৃত্ব প্রভুত্ব একমাত্র পরম পরাক্রান্তশালী আল্লাহর। (বলা হবে) আজ প্রত্যেক মানুষকে সে যা অর্জন করেছে-তার বিনিময় দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। আর আল্লাহ্ হিসাব নেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষীপ্র।

অবিশ্বাসের আবরণ সৃষ্টি করে যারা নিজেদের দৃষ্টিকে আবৃত করে রেখেছে, তাদের চোখে সত্য ধরা পড়ে না। কিয়ামত, বিচার, জান্নাত-জাহান্নাম তথা অদৃশ্য কোন শক্তিকে যারা বিশ্বাস করেনি, এসব ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেয়ারও প্রয়োজন অনুভব করেনি, সেদিন এদেরকে বলা হবে, যে অবিশ্বাসের পর্দা দিয়ে নিজেদের দৃষ্টিশক্তিকে আড়াল করে রেখেছিলে, আজ সে পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন দেখো না, আমার ঘোষণা কতটা সত্য ছিল। মহান আল্লাহ্ বলেন–

لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ–

(সেদিন আল্লাহ্ প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে বলবেন, এ দিনের প্রতি অবিশ্বাস করে তুমি অবহেলায় জীবন কাটিয়েছো) আজ তোমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। যা তুমি বিশ্বাস করতে চাওনি, অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাওনি, তা আজ দেখো এ সত্য দেখার জন্যে আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দিয়েছি। (সূরা কাফ-২২)

দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেয়ার অর্থ হলো, চোখের সামনের যাবতীয় পর্দাকে অপসারিত করা। মৃত্যুর পরে কি ঘটবে, মানুষ এ পৃথিবী থেকে তা দেখতে পায় না। যেসব কারণে তা দেখতে পায় না, সেদিন সেসব কারণসমূহ কার্যকর থাকবে না। ফলে পৃথিবীতে যারা ছিল অবিশ্বাসী, তারা নিজ চোখে সমস্ত দৃশ্য দেখে হতচকিত হয়ে যাবে। বিপদের ভয়াবহতা অবলোকন করে মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পালাতে থাকবে। কিন্তু পালানোর জায়গা সেদিন থাকবে না।

এই পৃথিবীই হবে হাশরের ময়দান

এই পৃথিবীটিই হাশরের ময়দান হবে। বর্তমানে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ একই রূপ নয়। কোথাও পানি, কোথাও বরফ, কোথাও বন-জঙ্গল, কোথাও আগ্নেয়গিরি, কোথাও পাহাড়-পর্বত উঁচু নিচু ইত্যাদি। কিন্তু কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দান কেমন হবে। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যত মানুষ

সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেসমস্ত মানুষ একটি ময়দানে একত্র হবে। তাহলে ময়দানটা কেমন হবে? বোখারী শরীফে এসেছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যমীনকে চাদরের মতো এমনভাবে বিছিয়ে দেয়া হবে, কোথাও একবিন্দু ভাঁজ বা খাঁজ থাকবে না।' ইসলামী পরিভাষায় হাশর বলা হয় কিয়ামতের পর পুনরায় পৃথিবীকে সমতল করে সেখানে সমস্ত সৃষ্টিকে হিসাব নিকাশ নেয়ার জন্যে একত্র করাকে। হাশর আরবী শব্দ। হাশর শব্দের আভিধানিক অর্থ একত্রিত করা, সমাবেশ ঘটানো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا - لَاتَرَى فِيهَا عِوَجًا وَّلَا أَمْتًا -

এ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, সেদিন এই পাহাড়গুলো কোথায় চলে যাবে ? আপনি বলে দিন, আমার রব তাদেরকে ধূলি বানিয়ে উড়িয়ে দেবেন এবং যমীনকে এমন সমতল, রুক্ষ-ধূসর ময়দানে পরিণত করা হবে যে, যেখানে তুমি কোন উঁচু-নীচু এবং সংকোচন দেখতে পাবে না। (সূরা ত্ব-হা-১০৬-১০৭)

মানুষের ভেতরে এমন অনেকে রয়েছে, যারা পরকাল অস্বীকার করে না। পরকাল বিশ্বাস করে কিন্তু কোরআনের আলোকে বিশ্বাস করে না। এদের ধারণা সমস্ত কিছু সংঘটিত হবে একটি আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্য দিয়ে। সেদিন যে দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যার ভেতরে আল্লাহর আরশ, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি অবস্থান করবে, তা হবে সম্পূর্ণ এক আধাত্মিক জগৎ। কোরআনের ঘোষণার সাথে তাদের ঐ বিশ্বাসের কোন সামঞ্জস্য নেই। কোরআন বলছে, যমীন ও আকাশের বর্তমান রূপ ও আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হবে। বর্তমানে যে প্রাকৃতিক আইন কার্যকর রয়েছে, সেদিন তা থাকবে না। ভিন্ন আইনের অধীনে দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন মহান আল্লাহ। এই পৃথিবীর যমীনকে পরিবর্তন করে হাশরের ময়দান বানানো হবে। এখানেই বিচার অনুষ্ঠিত হবে। মানুষের সেই দ্বিতীয় জীবনটি যেখানে এসব পরকালীন জগতের ব্যাপার ঘটবে–তা নিছক আধ্যাত্মিক ব্যাপার হবে না, বরং তা ঠিক এমনভাবেই দেহ ও প্রাণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হবে, এমনভাবে মানুষদেরকে জীবন্ত করা হবে, যেমন বর্তমানে মানুষ জীবিত হয়ে পৃথিবীতে রয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তি সেদিন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সহকারে সেখানে উপস্থিত হবে, যা নিয়ে সে পৃথিবী থেকে শেষ মুহূর্তে বিদায় গ্রহণ করেছিল। সেদিনের সে ময়দান সম্পর্কে সূরা ইবরাহীমের ৪৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ تُبَدَّلُ الاَرْضُ غَيْرَالاَرْضِ وَالسَّمٰوَاتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ-

যখন যমীন ও আসমান পরিবর্তন করে অন্য কিছু করে দেয়া হবে এবং সবকিছু পরাক্রমশালী প্রভুর সম্মুখে উন্মোচিত–স্পষ্ট হয়ে উপস্থিত হবে।

হাশরের দিন গোটা ভূ-পৃষ্ঠকে, নদী-সমুদ্রকে ভরাট করে পাহাড় পর্বতকে যমীনের উপর আছাড় দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং বন-জঙ্গলকে দূর করে গোটা ভূ-পৃষ্ঠকে মসৃন ধূষর রংয়ের এক বিশাল ময়দানে পরিণত করা হবে। এ ময়দানের আকৃতি যে কত বড় হবে, তা আল্লাহই জানেন।

সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে

সূরা কাহাফে বলা হয়েছে–

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الاَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا هُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا-

যখন আমি পাহাড়-পর্বতগুলোকে চালিত করবো তখন তোমরা যমীনকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখতে পাবে। আর আমি সমস্ত মানুষকে এমনভাবে একত্রিত করবো যে (পূর্বের ও পরের) কেউ বাকী থাকবে না। (সূরা কাহাফ-৪৭)

সেদিন মৃত্তিকা গর্ভে কিছুই থাকবে না

সেদিন মৃত্তিকা গর্ভে কিছুই থাকবে না। কারণ পৃথিবীতে মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর প্রয়োজনে আল্লাহ তা'য়ালা নানা স্থানে অজস্র ধরণের সম্পদ ও খাদ্যভান্ডার মওজুদ রেখেছেন। মাটির নীচে প্রচুর সম্পদসহ অন্যান্য বস্তু রয়েছে। এসব কিছু আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরত বলে তার বান্দাহ্দেরকে দান করেছেন। পৃথিবীতে জীবন ধারনের জন্যে এসবের প্রয়োজন। কিন্তু কিয়ামতের সময় মানুষের জীবন ধারনের কোন প্রশ্নই আসেনা। সুতরাং সম্পদের থাকারও প্রয়োজন নেই। জান্নাতে যা প্রয়োজন এবং দোযখে যা প্রয়োজন সবই আল্লাহ মওজুদ রেখেছেন। অতএব সেদিন মাটির নিচের সম্পদের কোন প্রয়োজন হবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

اِذَازُلْزِلَتِ الاَرْضُ زِلْزَالَهَا-وَاَخْرَجَتِ الاَرْضُ اَثْقَالَهَا-وَقَالَ الاِنْسَانُ مَالَهَا -

পৃথিবী তার গর্ভের সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে। মানুষ প্রশ্ন করবে–পৃথিবীর হলো কি?

সেদিন কবরে শায়িতদেরকে উঠানো হবে

মানুষ মৃত্যুর পর হতে অনন্ত অসীম জীবনে মহাবিশ্বের যে অংশে অবস্থান করে ইসলামী পরিভাষায় সে অংশকেই আলমে আখিরাত বা পরলোক বলে। আখিরাত দু'ভাগে বিভক্ত। আলমে বারযাখ এবং আলমে হাশর। মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরে কিয়ামতের মাঠে উঠার অর্থাৎ পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত যে জগতে অবস্থান করে, সে জগতই হলো আলমে বারযাখ। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আল কোরআনের সূরা মুমিনুনে বলেছেন–

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ–

এখন এসব মৃত মানুষদের পিছনে একটি বরযাখ অন্তরায় হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত। (সূরা মু'মিনূন-১০০)

বারযাখ শব্দের অর্থ হচ্ছে পর্দা বা যবনিকা। পৃথিবী ছেড়ে বিদায় গ্রহণের পরে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবী, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক জগতে মানুষের আত্মা অবস্থান করবে। এ আলমে বারযাখ এমনি একটি স্থান যেখান থেকে মানুষের আত্মা পৃথিবীতেও ফিরে আসতে পারবেনা বা জান্নাত-জাহান্নামেও যেতে পারবে না। এ আলমে বারযাখকেই কবর বলা হয়। আলমে বারযাখের দুটো স্তর। একটির নাম ইল্লিন অপরটির নাম সিজ্জিন। পৃথিবীতে যে সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহর আইন কানুন-বিধান মেনে চলেছে সে সমস্ত মানুষের আত্মা ইল্লিনে অবস্থান করবে। ইল্লিন যদিও কোন বেহেশ্‌ত নয়-তবুও সেখানের পরিবেশ বেহেশতের ন্যায়। পৃথিবীতে জীবিত থাকতে যারা আল্লাহর আইন মেনে চলেছে তারা মৃত্যুর পরে ইল্লিনে আল্লাহর মেহমান হিসেবে অবস্থান করবে।

আর যে সমস্ত মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চলেনি, এমনকি ইসলামকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছে, মৃত্যুর পরে তাদের অপবিত্র আত্মা সিজ্জিনে অবস্থান করবে। এটা জাহান্নাম নয় কিন্তু এখানের পরিবেশ জাহান্নামের মতোই। কবর আযাব বলতে যা বুঝায় তা এই সিজ্জিনেই হবে। কবর বলতে মাটির সে নির্দিষ্ট গর্ত বা গুহাকে বুঝায় না যার মধ্যে লাশ কবরস্থ করা হয়। ইন্তেকালের পরে মানুষের দেহ ব্যঘ্র, সর্প যদি ভক্ষণ করে ফেলে বা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অথবা সমুদ্রে কোন জীব জন্তুর পেটে চলে যায় তবুও তার আত্মা কর্মফল অনুযায়ী ইল্লিন অথবা সিজ্জিনে অবস্থান করবে। মানুষ মৃত্যুর পর এমন এক জগতে অবস্থান করে, যে জগতের কোন সংবাদ, বা তাদের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ স্থাপন পৃথিবীর জীবিত মানুষের পক্ষে অসম্ভবই শুধু নয়–সম্পূর্ণ অসাধ্য।

মৃত মানুষগণ কি অবস্থায় কোথায় অবস্থান করছে, তা পৃথিবীর জীবিত মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এ কারণেই মৃত্যুর পরের ও কিয়ামতের পূর্বের এ রহস্যময় জগতকে বলা হয় আলমে বারযাখ বা পর্দা আবৃত জগত। মৃত্যুর পরবর্তী জগত সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে কবরের বর্ণনা করা হয়েছে। আলমে বারযাখই হলো সেই কবর। কিয়ামতের সময় তৃতীয় ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষ ঐ কবর থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে এবং তারপরই শুরু হবে বিচার পর্ব। মহান আল্লাহ বলেন–

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا-وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

কিয়ামতের মুহূর্তটি অবশ্যই আসবে। এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আল্লাহ সেই মানুষদের অবশ্যই উঠাবেন যারা কবরে শায়িত। (সূরা হজ্জ-৭)

পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারা সবাই কবর থেকে বেরিয়ে আসবে।

মানুষ কবরসমূহ থেকে বের হয়ে পড়বে

সূরা ইয়াছিনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِّنَ الاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ-

পরে একবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। আর অমনি তারা নিজেদের রব-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য কবরসমূহ থেকে বের হয়ে পড়বে। (সূরা ইয়াছিন-৫১)

মানুষকে মৃত্যুর পরে যেখানে যে অবস্থায়ই দাফন দেয়া হোক অথবা পুড়িয়ে ফেলা হোক না কেন, সবার আত্মা আলমে বারযাখ বা কবরে অবস্থান করছে। সেখান থেকেই তারা হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। কবর থেকে উঠে এমনভাবে মানুষ আদালতে আখেরাতের দিকে দৌড়াবে যেমনভাবে মানুষ কোন আকর্ষণীয় বস্তু দেখার জন্য ছুটে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ-

সেদিন তারা কবর হতে বের হয়ে এমনভাবে দৌড়াবে যে, দেবতার স্থানসমূহের দিকে দৌড়াচ্ছে। তখন তাদের দৃষ্টি অবনত হবে। অপমান লাঞ্ছনা তাদেরকে (পাপীদেরকে) ঘিরে রাখবে। এটা সেই দিন যার ওয়াদা তাদের নিকট করা হয়েছিল। (সূরা মায়ারিজ-৪৩)

ভয়বিহ্বল চেহারা নিয়ে মানুষ দৌড়াতে থাকবে

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরা আদিয়াতে বলেছেন–

اَفَلاَ يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَافِى الْقُبُوْرِ –

তারা কি সে সময়ের কথা জানে না, যখন কবরে সমাহিত সবকিছু বের করা হবে।

কিয়ামতের দিন ভয়বিহ্বল চেহারা নিয়ে মানুষ আল্লাহর দরবারের দিকে দৌড়াতে থাকবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلَى شَىْءٍ نُّكُرٍ-خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ-

যেদিন আহ্বানকারী এক কঠিন ও দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান জানাবে, সেদিন মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে নিজেদের কবর সমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, যেন বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহ। (সূরা ক্বামার-৬-৭)

আধুনিক বিজ্ঞান জানাচ্ছে সমস্ত বিশ্বজগৎ অসংখ্য পরমাণু দ্বারা গঠিত। এ থিউরি অনুযায়ী কোন বস্তু বা জিনিষের নিঃশেষে ধ্বংস নেই। কোন প্রাণীর দেহকে যা-ই করা হোকনা কেন, তা নিঃশেষে ধ্বংস হয় না। মাটির সাথে মিশে থাকে। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে থাকা পরমাণুগুলো পুনরায় একত্রিত হয়ে পূর্বের আকৃতি ধারণ করবে। মানুষের দেহ পচে গলে যে অবস্থাই ধারণ করুক না কেন, তা সেদিন পূর্বের আকৃতি ধারণ করে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দেয়ার জন্যে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রশ্নের ভাষায় বলেন–

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الاَوَّلِ-بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ-

আমি কি প্রথম বার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? মূলত একটি নবতর সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে এই লোকগুলো সংশয়ে নিমজ্জিত। (সূরা ক্বাফ-১৫)

সে যুগেও ছিল বর্তমান যুগেও এক শ্রেণীর অজ্ঞ, মূর্খ, জ্ঞান পাপী আছে, যাদের ধারণা এই মানুষের দেহ সাপের পেটে বাঘের পেটে মাছের পেটে যাচ্ছে। মাটির গর্তে পচে গলে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এই শরীর কি পুনরায় বানানো সম্ভব ? সুতরাং হাশর, বিচার কিয়ামত একটা বানোয়াট ব্যাপার। পৃথিবীতে

যতক্ষণ আছো, খাও দাও ফূর্তি করো। এদেরকে উদ্দেশ্য করে সূরা কিয়ামাহ্-এর ৩-৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَيَحْسَبُ الاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَه-بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَه-

মানুষ কি মনে করে আমি তার হাড়গুলো একস্থানে করতে পারবো না? কেন পারবো না? আমি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গিরাসমূহ পর্যন্ত পূর্বের আকৃতি দিতে সক্ষম।

এই পৃথিবীতে মানুষ যে দেহ নিয়ে বিচরণ করছে, যে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে আল্লাহর বিধান পালন করেছে অথবা অমান্য করেছে, সেই দেহ নিয়েই সেদিন উত্থিত হবে। সূরা আম্বিয়ার ১০৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُه-

আমি যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি ঠিক অনুরূপভাবেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবো।

সেদিন কেউ বাদ পড়বেনা। প্রথম মানব সৃষ্টির দিন হতে চূড়ান্ত প্রলয়ের দিন পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীর আলো-বাতাসে এসেছে, তাদের সকলকেই একই সময়ে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ-لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ-

সেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। তারপর (সেদিন) যা কিছু ঘটবে তা সকলের চোখের সামনেই ঘটবে। (সূরা হুদ–১০৩)

অর্থাৎ পৃথিবীতে কারো বিচার চলাকালীন অনেক অবিচারই করা হয়। আসামীর চোখের আড়ালে তাকে ফাঁসানোর জন্যে কত কিছু করা হয়। কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে এমন করা হবে না। মানুষ প্রতি মুহূর্তে যা কিছু করছে তার রেকর্ড সংরক্ষণ করছেন সম্মানিত দু'জন ফেরেশতা। সে সব রেকর্ড মানুষ নিজেই পড়বে। সেই রেকর্ডের ভিত্তিতেই বিচার করা হবে। তার দৃষ্টির আড়ালে কিছুই করা হবে না। সূরা ওয়াকিয়ায় বলা হয়েছে–

قُلْ اِنَّ الاَوَّلِيْنَ وَالاٰخِرِيْنَ-لَمَجْمُوْعُوْنَ-اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ

হে রাসূল! আপনি বলে দিন, প্রথম অতীত হওয়া ও পরে আসা সমস্ত মানুষ নিঃসন্দেহে একটি নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত করা হবে, এর সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

অপরাধীদেরকে ঘিরে আনা হবে

কিয়ামতের দিন শরীর প্রকম্পিত হওয়ার মতো অবস্থা দেখে মানুষ ভয়ে এমনই দিশেহারা হয়ে পড়বে যে, তারা কিছুতেই স্মরণ করতে পারবে না পৃথিবীতে জীবিত থাকা কালে তারা কত দিন জীবিত ছিল। পরকালের সূচনা এবং তার দীর্ঘতা দেখে পৃথিবীর শত বছরের হায়াতকে তারা মনে করবে বোধ হয় এই ঘন্টাখানেক পৃথিবীতে ছিলাম। ইসলামী বিধান যারা মানেনি তারা সেদিন পৃথিবীতে কত হায়াত পেয়েছিল তা ভুলে যাবে। এ ভুলে যাওয়া কোন স্বাভাবিকভাবে ভুলে যাওয়া নয় বরং ভয়ে আতঙ্কে ভুলে যাবে। আল্লাহ বলেন–

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا-يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ عَشْرًا-

অপরাধীদেরকে এমনভাবে ঘিরে আনবো যে তাদের চক্ষু আতংকে বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। তারা পরস্পর ফিসফিস্ করে বলাবলি করবে, আমরা পৃথিবীতে বড় জোর দশদিন মাত্র সময় কাটিয়েছি। (সূরা ত্ব-হা-১০২)

মহান আল্লাহ সেদিন মানুষকে প্রশ্ন করবেন–

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الاَرْضِ عَدَدَسِنِيْنَ-قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ-

তোমরা পৃথিবীতে কতদিন ছিলে? উত্তরে তারা বলবে একদিন বা তার চেয়ে কম সময় আমরা পৃথিবীতে ছিলাম। (সূরা মুমিনুন-১১২-১১৩)

আল্লাহর কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَيَومَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ-مَالَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ-

যখন সে সময়টি এসে পড়বে, তখন অপরাধীগণ শপথ করে বলবে যে পৃথিবীতে আমরা এক ঘন্টার বেশি ছিলাম না। (সূরা রূম-৫৫)

সেদিন আল্লাহ বিরোধিদের চেহারা ধূলি মলিন হবে

কিয়ামতের ময়দানে ঐলোকগুলোর মুখমন্ডল ধূলিমলিন হবে, পৃথিবীতে যারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করেছিল এবং আল্লাহর বিধান অনুসরণে অবহেলার পরিচয় দিয়েছে। এই পৃথিবীতে শত কোটি মানুষ। কেউ কালো কেউ ফর্সা। কেউ মোটা কেউ পাতলা। কেউ সুন্দর কেউ অসুন্দর কুৎসিত। কারো

চেহারা এতই সৌন্দর্য মন্ডিত যে, একবার দেখে সাধ মিটে না, বার বার দেখতে ইচ্ছে করে। আবার কারো চেহারা এতই কুৎসিত যে, প্রথম দৃষ্টিতেই মনে বিতৃষ্ণা চলে আসে।

কিন্তু কতক কুৎসিত মানুষের মন, আমল-আখলাক এতই সুন্দর যে, মহান আল্লাহ তাদের উপর রাজী-খুশী থাকেন। আবার কতক সুন্দর চেহারার মানুষ আছে, যাদের মন-মানসিকতা, স্বভাব-চরিত্র এতই জঘন্য যে, খোদ শয়তানও তাদের ক্রিয়াকর্ম দেখলে দূরে সরে যায়। এই পৃথিবীতে বোধহয় সবচেয়ে কঠিন মানুষকে চেনা। সুন্দর মিষ্টি ভদ্র চেহারার আড়ালে জঘন্য মন লুকিয়ে থাকে। ভদ্রতার মুখোশ পরে ভদ্র-সৎ মানুষদের সাথে এই পাপীরা মেশে। পৃথিবীতে এদের চেহারা দেখে অনুমান করা যায় না এরা কত জঘন্য অপরাধী। কিন্তু কিয়ামতের দিন! সেদিন ওই পাপীদের চেহারা এমন হবে যে, ওদের চেহারার দিকে তাকালেই স্পষ্ট চেনা যাবে এরা পাপী। সূরা আবাসায় মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনবলেন–

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ-وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ-تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ-أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ-

এবং সেদিন কতিপয় মুখমন্ডল ধূলিমলিন হবে। কালিমা লিপ্ত অন্ধকার লিপ্ত অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হবে। এরাই হলো অবিশ্বাসী ও পাপী লোক।

যারা আসামী-অপরাধী তাদের চেহারা-ই বলে দেবে সেদিন তারা পাপী। পবিত্র কোরআনের সূরা আর রাহ্মানের ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ-

অপরাধীগণ সেখানে নিজ নিজ চেহারা দিয়েই পরিচিত হবে এবং তাদেরকে কপালের চুল ও পা ধরে চ্যাংদোলা করে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাওয়া হবে।

সূরা ইবরাহীমে বলা হয়েছে–

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ-سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ-

সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে, শিকল দ্বারা শক্ত করে হাত-পা বাঁধা রয়েছে এবং গায়ে গন্ধকের পোষাক পরানো হয়েছে। আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন করে রেখেছে। (সূরা ইবরাহীম-৪৯-৫০)

গন্ধক আগুনের স্পর্শ পেলে যে কিভাবে জ্বলে ওঠে তা সবাই জানে। সেদিন পাপীদের শরীরে গন্ধকের পোষাক পরিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আগুন তাদের হাড় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু কখনো মৃত্যু হবে না। আযাবের পরে কঠিন আযাবই শুধু ভোগ করবে।

জ্ঞানপাপীদেরকে অন্ধকরে উঠানো হবে

মানুষ পৃথিবীতে সামান্য দু'দিনের জীবন সুন্দর করার জন্য কত রকমের সাধনা-চেষ্টা করে। সন্তান যখন দু'আড়াই বছর বয়সে কথা বলতে শেখে তখন থেকেই তাকে লেখা-পড়া শিক্ষা দেয়। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রী অর্জন করার পরেও তাকে আরো উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিদেশে পাঠায়।

এ সবই করা হয় পৃথিবীতে সুন্দরভাবে জীবন-যাপনের জন্য। কিন্তু এই দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত স্বল্প সময়ের। স্বল্প সময়ের এই জীবনকে সুন্দর করার জন্য এত চেষ্টা-সাধনা। অথচ পরকালের অনন্তকালের জীবন সুন্দর করার জন্য কোন প্রচেষ্টা নেই। বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করে শিক্ষিত হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। কিন্তু নিজের ঘরে কোরআন শরীফ, সেটা একবার খুলেও দেখছে না এর ভেতর কি আছে। ইসলাম সম্পর্কে যারা জ্ঞান অর্জন না করে শুধু অন্যান্য বিষয়েই বিরাট বিরাট পন্ডিত, বুদ্ধিজীবী সেজেছে, তাদেরকে আল্লাহ্ অন্ধ বলেছেন। কারণ এদের চোখ থাকতেও এরা কোরআন হাদিস, ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে সেই অনুযায়ী কাজ করেনি। সত্য পথ এই সব জ্ঞানপাপী, পন্ডিত, বুদ্ধিজীবীগণ দেখার চেষ্টা করেনি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلاً–

আর যারা পৃথিবীতে (সত্য দেখার ব্যাপারে) অন্ধ হয়ে থাকবে, তারা আখেরাতেও অন্ধ হয়েই থাকবে। বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে তারা অন্ধদের চেয়েও ব্যর্থকাম। (বনী-ইসরাইল-৭২)

পৃথিবীতে কত দৃষ্টিবান মানুষ এই চোখ দিয়ে নানা ধরনের পুস্তক পড়ে, গবেষণা করে, পর্যবেক্ষণ করে বিরাট বিরাট পন্ডিত হচ্ছে। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে অন্ধই থেকে যাচ্ছে। আবার কত দৃষ্টিহীন অন্ধ মানুষ, যারা অপরের সাহায্যে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে ইসলামের বিধান মেনে চলছেন। জ্ঞানপাপীদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ বলেছেন এরা প্রকৃত অন্ধদের চেয়েও অন্ধ ব্যর্থকাম। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا-مَأْوهُمْ جَهَنَّمُ-

আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন অন্ধ, বোবা ও কালা (বধির) করে উল্টো করে টেনে নিয়ে আসবো। এদের শেষ পরিণতি জাহান্নাম। (সূরা বনী-ইসরাইল-৯৭)

এই সমস্ত জ্ঞান পাপী মুর্খ পন্ডিতগণ যারা ইসলামী জ্ঞান অর্জনও করেনি মেনেও চলেনি বা বিশ্বাসও করেনি। এরা যখন কিয়ামতের ময়দানে অন্ধ হয়ে উঠবে তখন এরা কি বলবে সে সম্পর্কে সূরা ত্বাহায় মহান আল্লাহ বলেন–

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعْمى-قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا-

কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো তখন সে বলবে, হে রব! পৃথিবীতে তো আমি দৃষ্টিমান ছিলাম কিন্তু এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে?

পৃথিবীতে যারা জীবিত থাকতে নিজের খেয়াল খুশী মতো চলেছে, তারা কিয়ামতের ময়দানে ভয়াবহ অবস্থা স্বচোক্ষে দেখে অনুশোচনা-অনুতাপ করবে। আফসোছ করে বলবে কেন আমি এই পরকালের জীবনের জন্যে কিছু অর্জন করে পাঠাইনি! কিন্তু মৃত্যুর পরে তো কোন অনুতাপ আফসোছ কাজে আসবে না। কোরআন শরীফে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন ওই পাপীদেরকে আফসোছ করতে দেখে তিনি বলবেন, 'কেন, পৃথিবীতে তো আমি তোমাদেরকে যথেষ্ট হায়াত দিয়েছিলাম, তখন তো আজকের এই অবস্থাকে তোমরা অবিশ্বাস করেছো।' পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَجِائَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ-يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّى لَهُ الذِّكْرى-يَقُوْلُ يلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ-

আর জাহান্নামকে সেদিন সবার সামনে হাজির করা হবে। তখন মানুষের বিশ্বাস জন্মাবে। কিন্তু তখন তার বিশ্বাস অবিশ্বাসের তো কোন মূল্য থাকবে না। আফসোস করে তখন সে বলতে থাকবে, হায়! আমি যদি এই জীবনের জন্যে অগ্রিম কিছু পাঠাতাম! (সূরা ফজর-২৩-২৪)

সেদিন মানুষ সবকিছু প্রত্যক্ষ করবে

পৃথিবীতে মানুষ যা করছে, তা সবই কিয়ামতের দিন সে নিজ চোখে দেখতে পাবে। আল্লাহর সৃষ্টি এই মানুষ আল্লাহর দেয়া জ্ঞান দিয়েই কত কিছু আবিষ্কার করেছেন এবং করছে। মানুষে কণ্ঠস্বর, ছবি, ক্রিয়াকান্ড, হাসি, কান্না শত শত বছর ফিতার মাধ্যমে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছে। তেমনিভাবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষের সকল কর্মকান্ড, কথা ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের নিজের আমলসমূহ কিয়ামতের দিন পেশ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَاقَدَّمَتْ يَدَهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا–

সেদিন মানুষ সবকিছু প্রত্যক্ষ করবে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রিম পাঠিয়েছে। তখন প্রতিটি অবিশ্বাসী কাফের চিৎকার করে বলবে, হায়! আমি যদি (আজ) মাটি হয়ে যেতাম। (সূরা আন নাবা-৪০)

সেদিন নেতা ও অনুসারীগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করবে

পৃথিবীর এমন মানুষের সংখ্যা অগণিত, যারা নিজেদের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগায় না। অপরের পরামর্শ অনুযায়ী চলে। কেউ চলে পিতা-মাতার কথা অনুযায়ী। কিন্তু চিন্তা করে দেখে না পিতা-মাতার কথা ইসলাম সম্মত কিনা। আবার কেউ চলে নেতাদের কথা অনুযায়ী। চোখে দেখছে, মসজিদে আজান হচ্ছে, নামাজের সময় চলে যাচ্ছে তবুও নেতা বক্তৃতা করেই যাচ্ছেন। নেতা নিজেও নামাজ আদায় করছে না দলের লোকদেরকে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছে না। এই ধরনের খোদাদ্রোহী নেতৃবৃন্দের কথা অনুযায়ী এক শ্রেণীর মানুষ চলে। আবার আরেক ধরনের মানুষ আছে যারা অন্ধভাবে পীর-মওলানাদের কথা অনুযায়ী চলে। চিন্তা করে দেখে না, পীর বা মওলানা সাহেবের কথার সাথে আল্লাহ রাসুলের কথার মিল আছে কিনা। পীর বা মাওলানা হলেই যে সে ফেরেশতা হয়ে যাবে এটা তো কোন যুক্তি নয়। পৃথিবীতে যারা নিজে ইসলামী জ্ঞান অর্জন না করে অন্যের পরামর্শে ভুল পথে চলে তাদের অবস্থা কিয়ামতের দিন কেমন হবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً–يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ

اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا-لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْجَاءَ نِىْ-

অপরাধী জালিমগণ সেদিন নিজের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলবে-হায়, আমি যদি রাসূলের সংগ গ্রহণ করতাম। (অর্থাৎ রাসূলের দেয়া আদর্শ যদি মেনে চলতাম) হায় আমার দুর্ভাগ্য! অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। তার প্ররোচনায় পড়েই আমি সে নসীহত গ্রহণ করিনি যা আমার নিকট এসেছিল। (সূরা ফুরকান-২৭-২৯)

অর্থাৎ ওই সমস্ত ব্যক্তিকে যদি অনুসরণ না করতাম, যারা আমাকে ভুল পথে চালিয়েছে। তাদের কারণেই আমি ওই সমস্ত মানুষদের কথা শুনিনি−যারা আমাকে ইসলামের পথে ডেকেছে। অপরাধীগণ আযাবের ভয়াবহ অবস্থা দেখে বলবে, যদি এই হাশর বিচার না হতো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন−

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا-وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ-تَوَدُّلَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَه اَمَدًا بَعِيْدًا-

নিশ্চয়ই সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে। (সে ফল) হোক ভালো অথবা মন্দ, সেদিন তারা কামনা করবে যে, এ দিনটি যদি তাদের নিকট হতে দূরে অবস্থান করতো, তবে কতই না ভালো হতো। (আল-ইমরান-৩০)

পৃথিবীর আদালতে উকিল-ব্যারিষ্টারকে টাকার বিনিময়ে আসামীর পক্ষে নিয়োগ করা হয়। তারা নানা যুক্তি দিয়ে, কথার কূটকৌশল প্রয়োগ করে, মিথ্যে কারণ দেখিয়ে স্পষ্ট চিহ্নিত খুনী আসামীকেও নির্দোষ বানানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন! সেদিন এ সমস্ত কূট কৌশল চলবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের প্রতিটি মানুষের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা কোন মাধ্যম ছাড়াই কথা বলবেন, (অর্থাৎ হিসাব নেবেন) সেখানে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কোন উকিল বা দো-ভাষী থাকবে না। আর তাকে লুকিয়ে রাখার কোন আড়াল থাকবে না। সে যখন ডান দিকে তাকাবে তখন নিজের কৃতকর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আবার যখন বাম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে সেদিকেও নিজের কর্মসমূহ ছাড়া আর কিছুই দেখবেনা। যখন সামনের দিকে তাকাবে তখন জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখবেনা। অতএব অবস্থা যখন এই তখন তোমরা একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন হতে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করো। (বোখারী, মুসলিম)

অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে

পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধানে সাথে বিরোধিতা করেছে, ইসলামী আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে, কিয়ামতের ময়দানে যখন জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী তাদেরকে প্রশ্ন করবে। পবিত্র কোরআনের সূরা মুল্‌ক-এর ৭-৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ-تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ-كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ-

তারা যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন জাহান্নামের ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ ধ্বনি শুনতে পাবে। জাহান্নাম উথাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ-আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় তা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। প্রতিবারে যখনই তার ভেতরে কোন জনসমষ্টি (অপরাধী দল) নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার দ্বার রক্ষী সেই লোকদেরকে প্রশ্ন করবে, কোন সাবধানকারী কি তোমাদের কাছে আসেনি?

জাহান্নামের দ্বাররক্ষী বলবে, এই ভয়ঙ্কর স্থানে তোমরা কেমন করে এলে? এই জাহান্নামের মতো কঠিন স্থান আল্লাহ আর দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করেননি। আল্লাহর বিধান অমান্য করলে এই স্থানে আসতে হবে, পৃথিবীতে এ সংবাদ কি তোমাদেরকে কেউ অবগত করেনি? তখন জাহান্নামীগণ কি জবাব দিবে আল্লাহ তা শোনাচ্ছেন–

قَالُوْا بَلٰى قَدع جَاءَ نَا نَذِيْرٌ-فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ-اِنْ اَنْتُمْ الاَّ فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ-

তারা জবাবে বলবে, হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের কাছে এসেছিল বটে কিন্তু আমরা তাকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছি এবং বলেছি যে, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। আসলে তোমরা মারাত্মক ভুলের ভেতরে নিমজ্জিত রয়েছো। (সূরা মুল্‌ক-১)

সেদিন অপরাধীগণ আফসোস করবে

ইসলামী আন্দোলন বিরোধী জাহান্নামের যাত্রীরা প্রশ্নকারীকে বলবে, 'আমাদের কাছে নবী-রাসূল, আলেম-ওলামা, ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী এসেছিল। তারা আমাদেরকে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য করার জন্য দাওয়াত দিয়েছিল। আমরা তাদের দাওয়াত কবুল করিনি। তাদের সাথে আমরা বিরোধিতা করেছি।

আমরা তাদেরকে মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়ে বলেছি, তোমরা সেকেলে আদর্শ অনুসরণ করে চলছো। আল্লার বিধান বলে তোমাদের কাছে কিছুই নেই। ইসলামের নামে তোমরা নিজেদের বানানো আদর্শ দেশ ও জাতির বুকে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছো। দেশ ও জাতিকে তোমরা প্রগতির পথ থেকে সরিয়ে অধঃগতির দিকে নিয়ে যেতে চাও।' এই লোকগুলো সেদিন আফসোস করে নানা কথা বলবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ শোনাচ্ছেন, সেদিন তারা কি বলবে–

وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ–

আর তারা বলবে, হায় ! আমরা যদি শুনতাম ও অনুধাবন করতাম তাহলে আমরা আজ এই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম না! (সূরা মূলক-১০)

আমরা যদি কোরআনের কথা শুনতাম, ইসলামের বিধান অনুধাবন করে তা অনুসরণ করতাম, তা হলে আজ এই জাহান্নামে যেতে হতো না। ইন্না কুন্না লাকুম তাব'আন–আমরা যদি অনুসরণ করতাম–আমরা যদি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতাম, তাহলে আজ এই কঠিন অবস্থার মধ্যে নিপতিত হতাম না।

সেদিন সমস্ত বিষয় প্রকাশ করা হবে

পৃথিবীর মানুষ একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করে, গোপনে খুন, নারী ধর্ষণ, চুরি করে। ঘুষ খায়। সমাজে সে সব হয়ত কোনদিন প্রকাশ পায় না। কিন্তু সেদিন! সেদিন যে কত সাধু ধরা পড়ে যাবে তা আল্লাহই জানেন। সূরা হাক্কায় মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لاَ تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ–

সেদিন সমস্ত বিষয় প্রকাশ করা হবে। তোমাদের কোন তত্ত্ব ও তথ্যই লুকিয়ে থাকবে না।

সেদিন যমীন সমস্ত কিছু প্রকাশ করে দেবে

এই পৃথিবীর মাটির উপরে মানুষ বিচরণ করছে। কিয়ামতের দিন এই মাটি কথা বলবে। সূরা যিলযাল-এর ৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا–

সেদিন তা (জমিন) নিজের উপর সংঘটিত সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে৷

কোরআনের এই আয়াত প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল বলেন, 'তোমরা কি বলতে পারো, সেই অবস্থাটা কি-বা সে (মাটি) বলবে?' উপস্থিত লোকেরা বললো, 'আল্লাহ এবং তার রাসূলই এ বিষয়ে অধিক জানেন।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মাটি প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী লোক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যে, তার উপর (মাটির উপর) থেকে কে কি করেছে। মাটি এসব অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিবে। মানুষের আমল বা কর্ম সমূহকেই এ আয়াতে আখবার (সংবাদের নিদর্শন) বলা হয়েছে। (তিরমিজ ও আবু দাউদ)

যমীন তার উপরে যা কিছু ঘটবে সব কিছু কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে প্রকাশ করে দিবে, এ কথাটি সে যুগের মানুষের কাছে অদ্ভুত বিস্ময়কর মনে হয়েছে। অনেকে অবিশ্বাসও করেছে। মাটি কথা বলবে, এটা তাদের বোধহয় বোধগম্য হতো না। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের অপূর্ব আবিষ্কার সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, টেপ-রেকর্ডার, আলট্রাসনোগ্রাফী, কার্ডিওলজি, টেলেক্স, ফ্যাক্স, কম্পিউটার প্রভৃতির ব্যাপক প্রচলন ও ব্যবহার মানুষকে স্পষ্ট ধারণা দিচ্ছে-মাটি কথা বলবে এটা অসম্ভবের কিছু নয়। মানুষ নিজের মুখে যা বলে, তা বাতাসে ইথারের প্রবাহ, ঘরের প্রাচীর, ঘরের ছাদ ও মেঝেতে, ঘরের আসবাবপত্রের প্রতিটি বিন্দুতে বিন্দুতে সমস্ত কিছুর অণু-পরামাণুতে মিশে থাকে। মানুষের বলা কথা কণ্ঠ হতে উচ্চারিত যে কোন ধ্বনির ক্ষয় নেই ধ্বংস নেই।

মহাবিজ্ঞানী পরম করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনযখন চাইবেন তখন পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতে মিশে থাকা মানুষের কণ্ঠস্বর ও উচ্চারিত ধ্বনি ঠিক তেমন ভাবেই পুনরায় উচ্চারণ করাতে পারবেন-যেমন তা প্রথমবার মানুষের কণ্ঠ হতে উচ্চারিত বা ধ্বনিত হয়েছিল। মানুষ বহু শত বছর পূর্বে তার নিজের বলা কথা তখন নিজ কানেই শুনতে পাবে। তার পরিচিত লোকরাও শুনে বুঝতে পারবে এই কণ্ঠস্বর অমুকের। মানুষ পৃথিবীর বুকে যে অবস্থায় এবং যেখানে যে কাজ করেছে তার প্রত্যেকটি গতিবিধি ও নড়াচড়ার ছবি বা প্রতিবিম্ব মানুষের আশে পাশে নিচে উপরে যা থাকে অর্থাৎ পরিবেশের প্রতিটি জিনিষের উপরেই পড়ছে। মানুষের স্পন্দনের প্রতিটি ছায়া প্রতিটি বস্তুর উপরে প্রতিফলিত হচ্ছে।

বর্তমানে মানুষ স্যাটালাইটের মাধ্যমে যে কেরামতি দেখাচ্ছে, কিন্তু যে আল্লাহ মানুষকে ঐ স্যাটালাইট আবিষ্কারের জ্ঞানদান করেছেন, সেই আল্লাহ কি স্যাটালাইট বানিয়ে মানুষের প্রতিটি গতিবিধির ছবি ধরে রাখছেন না? মানুষ পানির অতল

প্রদেশে, তিমিরাচ্ছন্ন ঘন অন্ধকারে স্পষ্ট চবি তোলার জন্যে ক্যামেরা বানিয়ে তা ব্যবহার করছে। ঠিক তেমনি মানুষ নিঃছিদ্র ঘন অন্ধকারে কোন কাজ করলেও তার ছবি উঠে যাচ্ছে।

কারণ আল্লাহর এ বিশাল পৃথিবীর এমন শক্তিশালী ক্যামেরা বা আলোকরশ্মি চলমান আছে যার কাছে আলো অন্ধকারের কোন তারতম্য বা পার্থক্য নেই, তা যে কোন অবস্থায় কাছের ও দূরের যে কোন ছবি তুলতে সক্ষম। মানুষের যাতবীয় কর্ম তো বটেই এমনকি তার পায়ের নিচে চাপা পড়ে ছোট একটা উকুনও যখন মারা যাচ্ছে তখন তখনই সে ছবি উঠে যাচ্ছে। এসব ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব কিয়ামতের দিন চলচ্চিত্রের মতোই সমস্ত মানুষের দৃষ্টির সামনে ভাসমান ও ভাস্কর হয়ে উঠবে। মানুষ নিজের চোখেই দেখবে সে ডাকাতি, ছিনতাই করেছে, ষড়যন্ত্র করেছে, হত্যা করেছে, নারী ধর্ষন করেছে, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করেছে, সুদ, ঘুষ খেয়েছে সব কিছুই দেখতে পাবে। শুধু তাই নয়-মানুষের মনের মধ্যে যে সব চিন্তা চেতনা কামনা বাসনার উদয় হয় তা-ও বের করে মানুষের দৃষ্টির সামনে সারিবদ্ধভাবে রেখে দেয়া হবে।

বিচার দিবসে পাপীগণ নিজের দোষ অন্যে ঘাড়ে চাপাবে। মানুষ তার মানবিক দূর্বলতার কারণে অন্যের খেয়াল খুশী মতো কাজ করতে বাধ্য হয়, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর জন্যে, স্ত্রী-স্বামীর জন্যে, পিতা সন্তানের জন্যে, সন্তান পিতার জন্যে, বন্ধু-বন্ধুকে খুশী করার জন্যে, রাজনৈতিক নেতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে, পীর ও শিক্ষককে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে, উর্ধ্বতন অফিসারকে খুশী করে নিজের চাকরী পাকাপোক্ত করার জন্য, অথবা চাকরিতে প্রমোশনের জন্যে, মন্ত্রী, এম, পি, চেয়ারম্যান-মেম্বারকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমন কাজ করে, যে কাজ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

এ সমস্ত মানুষদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে হাশরের ময়দানে তাদেরকে চরমভাবে প্রতারিত ও নিরাশ হতে হবে এবং আযাব ভোগ করতে হবে। পরকালে তারা কঠিন আযাব ভোগ করবে, এ কথা পবিত্র কোরআনে বার বার উল্লেখ করে এ ধরনের আত্মপ্রবঞ্চিত দলকে সর্তক করে দেয়া হয়েছে।

সেদিন কর্মীগণ নেতাদের ওপরে দোষ চাপাবে

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ-وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا-كَذَالِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ-وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ-

যাদের কথায় (নেতা বা ক্ষমতাবান) মানুষ চলতো, তারা (নেতাগণ) কিয়ামতের দিন তাদের দলের লোকদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ কেটে পড়বে। নেতা এবং অনুসারীগণ সেদিনের ভয়ংকর শাস্তির ভয়াবহতা দর্শন করবে। নেতা এবং অনুসারীদের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসারীগণ বলতে থাকবে, যদি কোন প্রকারে আমরা একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমরা সেখানে (পৃথিবীতে নেতাদের) এদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম যেমন করে আজ তারা (নেতাগণ) আমাদের থেকে (বিচ্ছিন্ন) হয়েছে, কিন্তু মহান আল্লাহ সকলকেই (নেতা ও অনুসারীদেরকে) তাদের কর্মফল দেখিয়ে দিবেন যা তাদের জন্যে অবশ্যই অনুতাপ-অনুশোচনার কারণ হবে। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা সে জাহান্নামের আগুন থেকে কোনক্রমেই বের হতে পারবে না। (সূরা বাকারাহ্-১৬৬-১৬৭)

অতএব হায়াত থাকতে অবশ্যই মানুষকে সাবধান হতে হবে। কারো নির্দেশ মেনে চলা যাবে না, সে যত বড় নেতা হোক, যত বড় পীর-মাওলানা হোক না কেন। কেউ কোন নির্দেশ দিলে সে নির্দেশ ইসলাম সম্মত কিনা-তা যাচাই করে তারপর মেনে চলতে হবে। পৃথিবীতে যারা যাচাই-বাছাই না করে, যে কোন নেতা গোছের মানুষের অনুসরণ করেছে তাদের ও তাদের নেতাদের মৃত্যুকালের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ংকর। মৃত্যুর সময়ে ফেরেশ্তা তাদেরকে প্রশ্ন করবে-সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قَالُوْا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ قَالَ ادْخُلُوْا فِىْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰهُمْ لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ

لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لاَّ تَعْلَمُوْنَ ـ وَقَالَتْ اُوْلٰهُمْ لاُخْرٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের আইন-নির্দেশ মেনে চলতে, তারা আজ কোথায়? (উত্তরে) তারা বলবে, তারা (নির্দেশদাতাগণ) তাদের কাছ থেকে সরে পড়েছে। তারপর তারা স্বীকার করবে যে, তারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসই করেছে। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের মধ্যে জ্বিন এবং মানুষের মধ্যে যে দল অতিত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো। অতঃপর এদের একটি দল (অনুসারীগণ) যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন তাদেরই অনুরূপ দলের (নেতাগণের) প্রতি অভিশাপ করতে থাকবে। যখন সব দলগুলো (অনুসারী দল ও আল্লাহদ্রোহী নেতাদের দল) সেখানে প্রবেশ করবে তখন (অনুসারী দল-নেতাদের সম্পর্কে) পরবর্তী দল তার পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে একথা বলবে-হে প্রভু, ওরা (আল্লাহদ্রোহী নেতাগণ) আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদের উভয়ের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি। কিন্তু এ সম্পর্কে তোমরা কোন জ্ঞান রাখোনা।' তাদের প্রথমটি শেষেরটিকে বলবে, তোমরা আমাদের চেয়ে মোটেই উত্তম নও, অতএব তোমরা তোমাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ করো। (সূরা আরাফ)

ইসলাম বিরোধী নেতা-কর্মীরা জাহান্নামে কঠিন আযাব ভোগ করতে থাকবে এবং এরা একে অপরের প্রতি অভিশাপ দিতে থাকবে। এদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আহ্যাবের ৬৬-৬৭ নং আয়াতে বলেন-

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا-

যেদিন তাদের চেহারা আগুনে ওলট-পালট করা হবে তখন তারা বলবে, হায়! যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করতাম। তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব্ব! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর আভিশাপ বর্ষণ করো।

মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যারা পৃথিবীতে আন্দোলন করেছে, চেষ্টা-সাধনা করেছে, সেসব নেতাদের যারা অনুসরণ করেছে, সেসব কর্মীদেরকে যখন জাহান্নামের আগুনের ভেতরে জ্বালানো হবে, তখন তারা বলবে, পৃথিবীর ঐ সব নেতা এবং সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকগুলো আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা দান করেছে, তাদের কারণেই আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। হে আল্লাহ ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের উভয়ের (অনুসারীগণ ও খোদাদ্রোহী নেতাগণ) জন্যেই দ্বিগুণ আযাব। কিন্তু এ সম্পর্কে তোমরা কোন জ্ঞান রাখো না। তাদের প্রথমদল (অনুসারী দল) শেষের দলটিকে বলবে (নেতাদের দল) তোমরা আমাদের চেয়ে মোটেই উত্তম নও। অতএব তোমাদের অর্জিত কর্মের শাস্তি ভোগ কর।

নেতা ও কর্মীগণ একত্রে আযাব ভোগ করবে

পৃথিবীতে সাধারণত দেখা যায় যাদের অর্থ নেই, বিত্ত নেই, দুর্বল, যারা শোষিত তারাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ক্ষমতাবান মানুষদের অত্যাচারী খোদাদ্রোহী শাসকদের আইন-কানুন, নির্দেশ মেনে চলে। মানতে বাধ্য হয়। কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে এদের পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে–

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰؤُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَوْهَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ–

যখন উভয়দলকে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে, তখন দুর্বল মানুষগুলো ক্ষমতা গর্বিত উন্নত শ্রেণীর (ক্ষমতাবানদের) লোকদের বলবে, আমরা তোমাদেরই কথা মেনে চলেছিলাম। আজ তোমরা কি আল্লাহর আযাবের কিছু অংশ আমাদের জন্যে লাঘব করে দিতে পারো? তারা বলবে, তেমন কোন পথ আল্লাহ আমাদের দেখালে তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। এখন এ শাস্তি আমাদের জন্যে অসহ্য হোক অথবা ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করি উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। এখন আমাদের পরিত্রানের কোন উপায় নেই। (সূরা ইবরাহীম-২১)

অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে কর্মিদের দল আযাবের ভয়াবহতা দেখে তাদের নেতাদের বলবে, পৃথিবীতে আমরা ইসলামের বিধান মানিনি, তোমাদের নির্দেশ

মেনে চলেছি। আজ জাহান্নামের এই যে ভয়ংকর আযাব আমরা ভোগ করছি, ও নেতারা, আজ কি পারো আল্লাহর আযাব কিছুটা কমিয়ে দিতে। পৃথিবীতে তো তোমরা অনেক বড় বড় কথা বলেছো, অনেক ক্ষমতা দেখিয়েছো। আজ সেই ক্ষমতা একটু দেখাও না! খোদাদ্রোহী নেতারা বলবে, আযাব থেকে বাঁচার কোন পথ আমাদেরই জানা নেই, তোমাদের জানাবো কিভাবে? এখন আমরা সবাই যে শাস্তি ভোগ করছি, তা যতই অসহ্য হোক না কেন, অথবা ধৈর্যের সাথেই আযাব ভোগ করি না কেন। একই ব্যাপারে আজ আমরা ধরা পড়েছি। এই আযাব থেকে বাঁচার কোন পথ আর খোলা নেই। সূরা সাবার ৩১-৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرانِ وَلاَ بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ نِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْ لاَ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَه اَنْدَادًا وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الاَغْلٰلَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

এসব অবিশ্বাসীগণ বলে, কিছুতেই কোরআন মানবো না। এর আগের কোন কিতাবকেও মানবো না। তোমরা যদি তাদের অবস্থা (হাশরের দিন) দেখতে যখন ও জালেমরা তাদের প্রভুর সামনে দন্ডায়মান হবে এবং একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে থাকবে। সেদিন অসহায় দূর্বলগণ (পৃথিবীতে যারা ছিল অর্থবিত্তহীন) গর্বিত সমাজ পতিদের (পৃথিবীতে যারা ছিল ক্ষমতাবান) বলবে, তোমরা না থাকলে তো আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনতাম। (অর্থাৎ তোমরাই আমাদেরকে ইসলামী আইন মানতে দাওনি।) গর্বিত সমাজপতিরা দুর্বলদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট হেদায়েতের বানী পৌঁছার পর আমরা কি তোমাদেরকে সৎপথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম? তোমরা নিজেরাই তো অপরাধ করেছো।

দুর্বলেরা বড় লোকদের বলবে-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বরং তোমাদের দিবারাত্রির চক্রান্তই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছিল, আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তার আইন মানার ব্যাপারে, তার সাথে শরীক করতে তোমরাই তো আমাদের নির্দেশ দান করতে। তারা যখন তাদের জন্যে নির্ধারিত শাস্তি দেখতে পাবে তখন তাদের লজ্জা ও অনুশোচনা গোপন করার চেষ্টা করবে। আমরা এসব অপরাধীদের গলায় শৃংখল পরিয়ে দেব। যেমন তাদের কর্ম, তেমনি তারা পরিণাম ফল ভোগ করবে।

ইসলামের বিধান অমান্যকারীরা ওই সমস্ত মানুষদের সাথে শত্রুতা করে যারা পৃথিবীতে আল্লাহর আইন মেনে চলে। ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, মারধোর করে, নানাভাবে কষ্ট দেয়। হাশরের পরে ইসলামের দুশমনরা যখন জাহান্নামের যাবে –তখন তারা জাহান্নামের মধ্যে ওই মানুষগুলোকে খুঁজবে-পৃথিবীতে যারা ইসলামের আইন মেনে চলেছে। কোরআন শরীফ বলছে–

وَقَالُوْا مَالَنَا لاَنَرَاى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الاَشْرَارِ–

এবং তারা (অবিশ্বাসীরা জাহান্নামের মধ্যে থেকে) বলবে, কি ব্যাপার তাদেরকে তো দেখছি না, যাদেরকে আমরা দুষ্ট মানুষদের মধ্যে গণ্য করতাম। (অর্থাৎ পৃথিবীতে যাদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ, শত্রুতা করেছি, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়েছি) (সূরা সোয়াদ-৬২)

পৃথিবীতে মানুষ কখনো মুক্ত স্বাধীন হতে পারে না-হবার উপায়ও নেই। মানুষ কারো না কারো আইন মেনে চলেই। কেউ নিজের মনের আইন মানে, কেউ সমাজের সমাজপতিদের আইন মানে, নেতা-নেত্রীদের নির্দেশ মেনে চলে অর্থাৎ মানুষ একটা নিয়ম মেনে চলে। সে নিয়ম তার নিজের মনের বানানো অথবা অন্য মানুষের বানানো। হাশরের ময়দানে নেতা অর্থাৎ সমাজে বা দেশে, নিজ এলাকায় ছিল প্রভাবশালী, তারা এবং ওই সমস্ত মানুষ, যারা প্রভাবশালীদের নির্দেশ মেনে চলতো মুখোমুখি হবে। চোখের সামনে ভয়ংকর আযাব দেখে ওই প্রভাবশালী লোকদেরকে অর্থাৎ নেতাদেরকে সাধারণ মানুষ ঘিরে ধরবে। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলবে–এই তোমরা, তোমাদের কারনেই আজ আমরা জাহান্নামের যাচ্ছি। তোমাদেরকে আমরা নেতা বানিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেরাও ইসলামী আইন মানোনি আমাদেরকেও মানতে আদেশ করোনি।

প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় মানুষগুলো তখন বলবে-দেখো, আমরা তোমাদেরকে জোর করে আমাদের আদেশ মানতে বাধ্য করিনি। কেন তোমরা পৃথিবীতে আমাদের

পেছনে ছুটতে? আমাদের কি ক্ষমতা ছিল? আসলে তোমরা ইচ্ছা করেই ইসলামের আইন অমান্য করেছো। আমরাও ভুল পথে ছিলাম তোমরাও ভুল পথে ছিলে। এখন আমাদের সবাইকে জাহান্নাম যেতে হবে। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে যারা ইসলামের পথে চলতো, ইসলামের দিকে ডাকতো তারাই সত্য পথের পথিক ছিল।

সেদিন শয়তান নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করবে

কিয়ামতের ময়দানে শাস্তির ভয়াবহতা অবলোকন করে সমস্ত অপরাধীগণ সম্মিলিতভাবে ইবলিস শয়তানকে চেপে ধরে বলবে-আজ তোকে পেয়েছি। তুই আমাদেরকে পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট করেছিলি। আমাদের কাছে তুই ওয়াদা করেছিলি, আমরা যদি তোর কথা মতো চলি তাহলে সুখ শান্তি পাবো। কিন্তু কোথায় আজ সেই সুখ শান্তি? তখন শয়তান বলবে–দেখো, আজ আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ো না। আজ আমার কোন দায় দায়িত্ব নেই। আমি তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলাম সে ওয়াদা ছিল মিথ্যে, আমার দেখানো পথে চলতে আমি তোমাদেরকে বাধ্য করিনি, আমি তোমাদের ঘাড় ধরে আমার দলে ডাকিনি। দোষ আমার এতটুকুই যে, আমি তোমাদের ডাক দিয়েছি আর অমনি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। সূরা ইবরাহীমের ২২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন–

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْ تُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْ تُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ–

আর যখন চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হবে, তখন শয়তান বলবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ যেসব ওয়াদা করেছিলেন, তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম, তার মধ্যে একটিও পূরণ করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোন জোর ছিল না। আমি এ ছাড়া আর কিছুই

করিনি, শুধু এটাই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছো। এখন আমাকে দোষ দিও না, তিরস্কার করো না, নিজেরাই নিজেদেরকে তিরস্কার করো। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে রব্ব-এর ব্যাপারে অংশীদার বানিয়ে ছিলে, আমি তার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ ধরনের জালিমদের জন্য তো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত।

অর্থাৎ শয়তান ও তার অনুসারীরা পরস্পর দোষারোপ করতে থাকবে, তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন, আমার আইন মেনে চললে জান্নাত পাবে, না মানলে জাহান্নামে যাবে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর আমি তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলাম, তা ভঙ্গ করেছি। এখন আমার উপর তোমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই। আমি তো শুধু পৃথিবীতে তোমাদেরকে ডাক দিয়েছি, আর অমনি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো। সুতরাং আজ আমার উপর দোষ চাপিও না বরং নিজেদেরকে দোষ দাও। কারণ আমি তোমাদের ঘাড় ধরে কিছু করাইনি আর তোমারাও আমাকে জোর করে কিছু করাওনি। তোমরা আমার পথ ধরে যে কুফরি করেছো, সে সবের দায় দায়িত্ব আমার নয়, আমি সব অস্বীকার করছি।

চুলচেরা হিসাবের দিন হাশরের ময়দান

চুলচেরা হিসাবের দিন হাশরের ময়দান। কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে যখন মানুষের সমস্ত কাজের বিচার অনুষ্ঠিত হবে-সেদিনটিকে মহান আল্লাহ কোরআন শরীফে মানুষের জয় পরাজয়ের দিন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সফলতা ও ব্যর্থতার দিন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন–

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ
لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ فَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَ
رَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْ اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ يَوْمَ
يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

অবিশ্বাসীগণ বড় অহংকার করে বলে বেড়ায়, মৃত্যুর পরে আর কিছুতেই তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে না। (হে নবী) তাদেরকে বলে দিন, আমার প্রভুর শপথ-নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পরকালে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। তারপর তোমরা পৃথিবীতে যা যা করেছো, তা জানানো হবে। আর এসব কিছুই আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই 'নূরের' প্রতি যা আমি অবতীর্ণ করেছি। তোমরা যা কিছু করো, তার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ অবগত। এসব কিছুই তোমরা জানতে পারবে সেই দিন, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সেই মহাসম্মেলনের (হাশরের দিনে মানুষের জমায়েত) জন্যে একত্র করবেন। সেদিনটা হবে পরস্পরের জন্যে জয়-পরাজয়ের দিন। যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, আল্লাহর তাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার দান করবেন। যে জান্নাতের নিম্নভাগে দিয়ে প্রবাহিত হবে স্রোতস্বিনী। তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে। আর এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য। অপরদিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের অস্বীকার করবে এবং মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে আমার বাণী ও নিদর্শন, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সে স্থান হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা তাগাবুন-৭-১০)

এই আয়াতে 'নূর' বলতে কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। কোরআন শরীফের অনেকগুলো নাম আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। নূর আরবী শব্দ। যার অর্থ হলো স্পষ্ট উজ্জ্বল আলো। সুতরাং কোরআন শরীফ এমনি উজ্জ্বল আলোর ন্যায়-যা অবতীর্ণ হয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায় অবিচারের অন্ধকারকে দূর করে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করতে। মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টি করে তাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছেন। সে ইচ্ছে করলে তার স্রষ্টা আল্লাহ, তার নবী-রাসূল, তার জীবন বিধান কোরআন অস্বীকার করে পৃথিবীতে যেমনভাবে মন চায় তেমনভাবে চলতে পারে। অবশ্য এভাবে চললে মানুষের পরিণাম যে কি হবে, তা-ও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। আবার মানুষ ইচ্ছে করলে আল্লাহ, রাসুল, কোরআন ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে পৃথিবীতে অত্যন্ত সৎভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। এভাবে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করলে তার ফলাফল যে কি, তা-ও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যেমন স্বাধীনতা দান করেছেন, সৎ এবং অসৎ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সৎপথে চললে পুরস্কার এবং অসৎপথে চললে

শাস্তি-এ ঘোষনাও দিয়েছেন, তেমনিভাবে এ পরীক্ষাও তিনি মানুষের কাছ থেকে নেবেন পৃথিবীর জীবনে কোন মানুষ জয়ী বা সফল হলো আর কোন মানুষ পরাজিত বা ব্যর্থ হলো।

হাশরের ময়দানে সবেচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি

পৃথিবীতে একজন মানুষ তার নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধি ও কর্মশক্তি নিয়ে জীবন পথে চলা শুরু করে। পৃথিবীতে একটু স্বচ্ছলতা, একটু শান্তি, সুন্দরভাবে বসবাসের জন্যে তার চেষ্টা সাধনার অন্ত থাকে না। প্রতিটি মানুষই জীবনের পথে সফলতা অর্জন করতে চায়। মানুষের প্রতিদিনের এই যে চেষ্টা সাধনা, এত শ্রমদান এর পরিণামেই হয় জয়-পরাজয়ের নির্ধারণ–অর্থাৎ এত কিছু করে কে সফল হলো আর কে হলো ব্যর্থ। পৃথিবীতে সফলতা ও ব্যর্থতার সংজ্ঞা সমস্ত মানুষের কাছে এক রকম নয়। এর কারণ হলো সমস্ত মানুষের আদর্শ এক রকম না। মানুষ বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী, সেহেতু তাদের কাছে সফলতা ও ব্যর্থতার ধরণও আলাদা।

কোন মানুষ হয়তঃ চরম অন্যায় পথ অবলম্বন করে অসৎভাবে তার উদ্দেশ্য হাছিল করলো, অনেকে তার সম্পর্কে মন্তব্য করলো মানুষটি তার সাধনায় সফল হয়েছে। এই সফলতা অর্জন করতে গিয়ে যদি অন্যায় অবিচার, চরম দুর্নীতি, অসত্য, হীন ও জঘণ্য পন্থা অনুসরণ করতে হয়, তবুও তাকে মনে করা হয় সাফল্য। জোর করে শক্তি দিয়ে অন্যায়ভাবে অপরের ধন-সম্পদ হস্তগত করে, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমানাদীর দ্বারা কাউকে সর্বশান্ত করে কেউ হচ্ছে বিজয়ী, কোটি কোটি টাকার মালিক, হরেক রকমের গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়ে স্ত্রী সান্তনাদিসহ পরম সুখে বিলাস বহুল জীবন-যাপন করে, অনেকের দৃষ্টিতে এটা সফলতা। মানুষ বলে লোকটা সফল।

অসৎ পথ ধরে অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হয়ে কেউ বা সমাজে তার আধিপত্য বিস্তার কতে সক্ষম হয়। সে চায় সবাই তার কাছে নত হয়ে থাক। তার বিরুদ্ধে সামান্য টু-শব্দও সে সহ্য করতে পারে না, স্বার্থবাদী চাটুকারের দল দিনরাত তার জয় গান গেয়ে বেড়ায়। তার দাপটে কেউ সত্য কথা বলতে পারে না। যারা সত্য পথে চলে সত্য কথা বলে তারা ওই ব্যক্তি কর্তৃক নির্যাতিত হয়। ক্ষমতার দাপটে দিশেহারা হয়ে সে সবার উপরে খোদায়ী করতে চায়। অনেকের মতে এটাও সফলতা।

অপরদিকে কোন ব্যক্তি সত্যকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সৎভাবে জীবন-যাপন করে। দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ, কালোবাজারী, মিথ্যা প্রতারণা, প্রবঞ্চনা সে করে না, ফলে সমাজে সে ক্ষমতাবান অর্থশালীও হতে পারে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে কথা বলে, সমাজ থেকে দেশ থেকে সে সবধরনের অন্যায় উৎখাত করে সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ফলে সমাজ বা দেশের ক্ষমতাবান অসৎ মানুষগুলো তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে। পরিণামে সে অত্যাচারিত হয়। তার সকল আত্মীয়-স্বজন তাকে ত্যাগ করে। সমাজ তাকে অবহেলা করে। অনেকে ওই সৎমানুষটি সম্পর্কে মন্তব্য করে, মানুষটা দারুণ বোকা, তা না হলে এভাবে সত্য কথা বলতে গিয় এমন অত্যাচার সহ্য করে নাকি? অযথা নিজের জীবনটা ব্যর্থ করে দিল! এই ধরণের সফলতা ও ব্যর্থতা বর্তমান পৃথিবীতে চারদিকেই দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু সত্যিকারের সফলতা ও ব্যর্থতা, জয়-পরাজয় নির্ধারণ হবে কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালতে। বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণনাকৃত একটি হাদীসে পাওয়া যায়। যারা বেহেশতে যাবে তাদের সবাইকে জাহান্নামের একটি অংশ দেখিয়ে জানানো হবে–ওই অংশটা তোমার ভাগে পড়তো, যদি তুমি পাপী হতে। ফলে বেহেশ্তবাসীগন আল্লাহর প্রতি আরো বেশী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। আবার জাহান্নামবাসীদের জান্নাতের একটি অংশ দেখিয়ে জানানো হবে-জান্নাতের ওই অংশটা তোমার নছিবে জুটতো, যদি তুমি পৃথিবীতে ইসলামী বিধান মেনে চলতে। ফলে জাহান্নামবাসীদের অনুতাপ-অনুশোচনা আরো বেশী বৃদ্ধি পাবে।

পৃথিবীতে যারা ক্ষমতাবান জালিম ব্যক্তির দ্বারা যতটুকু অত্যাচারীত হবে, কিয়ামতের ময়দানে ওই জালিমের যদি নেক কাজ থেকে থাকে, তা দিয়ে দেয়া হবে তাদেরকে, যাদের সাথে সে অন্যায় করেছে। যদি নেক কাজ না থাকে তাহলে যে ব্যক্তির সাথে সে অন্যায় করেছে। যদি নেক কাজ না থাকে তাহলে যে ব্যক্তির সাথে সে অন্যায় করেছে, ওই ব্যক্তির গোনাহ্ থাকলে তা চাপানো হবে জালিমের ঘাড়ে। যে পরিমাণ জুলুম করবে, সেই পরিমান নেক কাজ দিয়ে দিতে হবে বা গোনাহ্ নিজের কাঁধে নিতে হবে। কারণ সেদিন তো মানুষের কাছে কোন ধন-সম্পদ থাকবে না। সুতরাং তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সে যার যার সাথে জুলুম করেছে, তাকে তাকে নেক দিয়ে দেয়ার মাধ্যমে।

এভাবে নেক কাজ দিতে দিতে যখন আর দেয়ার মতো নেক কাজ থাকবে না, তখন ওই সমস্ত মানুষের গোনাহ তাকে নিতে হবে যাদের উপরে সে জুলুম

করেছে। অবশ্য যার সাথে যে পরিমান অন্যায় করা হবে, ঠিক সেই পরিমানই সে প্রতিপক্ষের নেকি লাভ করবে। অথবা জালিমের আমল নামায় কোন নেকি না থাকলে মজলুমের ততো পরিমাণ গোনাহ্ জালিমের ঘাড়ে চাপানো হবে। বোখারী শরীফে অন্য একটি হাদীসে আছে হযরত আবু হোরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, কোন মানুষ যদি অন্য মানুষের সাথে অন্যায় করে থাকে তাহলে তার উচিত এই পৃথিবীতেই তা মিটিয়ে ফেলা। কারণ আখেরাতে কারো কাছে কোন দেয়ার মতো সম্পদ থাকবে না। নেকী ও গোনাহ ছাড়া। অতএব সেদিন তার নেকীর কিছু অংশ সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে হবে। অথবা তার কাছে যথেষ্ট নেকী না থাকলে মজলুমের ততো পরিমান গোনাহের অংশ তাকে দেয়া হবে।

মুসনাদে আহমদে জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন উনায়েস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন জান্নাতী জান্নাতে এবং কোন জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারবে না-যতক্ষণ সে যার যার সাথে অন্যায় করেছে তাদের দাবী না মিটানো পর্যন্ত। এমনকি সে যদি কাউকে অন্যায়ভাবে একটি চড় দিয়ে থাকে, তার বিনিময় তাকে অবশ্যই মিটিয়ে দিতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেদিন তো আমরা কপর্দকহীন থাকবো, বিনিময় দেবো কি দিয়ে?' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'নেকী-গোনাহের দ্বারা বিনিময় দিতে হবে।' মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, একদিন আল্লাহর রাসূল সমবেত সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কি জানো, সব চেয়ে নিঃস্ব কোন ব্যক্তি? সাহাবাগণ বললেন, 'যে কপর্দকহীন এবং যার কোন সম্পদ নেই, সেই তো সবচেয়ে নিঃস্ব।'

তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে ওই ব্যক্তি সব চেয়ে নিঃস্ব যে ব্যক্তি নামজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য নেকির পাহাড় সাথে নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে হাজির হবে। সে ব্যক্তি তার চারদিকে শুধু নেকীই দেখতে পাবে। ব্যক্তিটির চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল থাকবে। তারপর একের পর এক লোক এসে দাবী জানাবে, সে অন্যায়ভাবে আমাকে মেরেছিল, কেউ দাবী করবে সে আমার সম্পদ কেড়ে নিয়েছিল, কেউ দাবী করবে ওই ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করে আমাকে হত্যা করিয়েছিল, কেউ বলবে সে আমাকে গালি দিয়েছিল, কেউ দাবী করবে সে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ দিত, কেউ দাবী করবে আমার পাওনা টাকা সে দেয়নি।

তখন সমস্ত পাওনাদারের দাবী মিটানো হবে ওই ব্যক্তির নেকী দ্বারা। লোকটির নেকী শেষ হয়ে যাবে কিন্তু পাওনাদার শেষ হবে না। তখন অবশিষ্ট পাওনাদারের গোনাহ্ তার উপরে চাপানো হবে। নেকীর পাহাড় সাথে নিয়ে কিয়ামতে উঠেও গোনাহের পাহাড় কাঁধে নিয়ে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। এই ব্যক্তিই সবেচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি।

সেদিন মানুষকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে

কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করবেন। তার মধ্যে পাঁচটি প্রশ্ন থাকবে প্রধান প্রশ্ন। এই পাঁচটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে যে, তাকে অবশ্য অবশ্যই কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে। ওই পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেউ এদিক ওদিক এক পা-ও যেতে পারবে না। তিরমিজী শরীফে এসেছে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন—সেদিন মানবজাতিকে প্রধানতঃ পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। তার জবাব না দিয়ে তারা এক পা অগ্রসর হতে পারবে না। প্রশ্নগুলো হচ্ছে −(১) তার জীবনের সময়গুলো সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? (২) (বিশেষ করে) তার যৌবন কাল সে কোন কাজে ব্যয় করেছে? (৩) কিভাবে সে অর্থ উপার্জন করেছে? (৪) তার উপার্জিত অর্থ-সম্পদ সে কিভাবে কোন পথে ব্যয় করেছে? (৫) সে যে সত্য জ্ঞান লাভ করেছিল, সে জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু জীবন-যাপন করেছে?

এই পাঁচটি প্রশ্নের ভেতর দিয়েই একজন মানুষের গোটা জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। সাধারণতঃ মানুষ তার জীবন পৃথিবীতে দুইভাবে অতিবাহিত করতে পারে। (১) আল্লাহ, রাসূল, পরকাল, আল্লাহর নাজিল করা কিতাবের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কঠিন ভাবে মেনে চলার মাধ্যমে। (২) আল্লাহ, রাসূল, পরকাল, আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাব অবিশ্বাস (বা এগুলোর প্রতি ঠুনকো বিশ্বাস) করে পৃথিবীতে যেমন খুশী তেমনভাবে জীবন-যাপন করা।

পৃথিবীতে মানুষ তার গোটা জীবনের সময় বিশেষ করে যৌবন কাল কোন পথে অতিবাহিত করেছে। যৌবনকাল মানব জীবনের এমন সময় যখন তার কর্মশক্তি ও বৃত্তিনিচয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। বিকশিত হয় তার যৌন প্রবণতা। কূলে কূলে ভরা যৌবনদীপ্ত নদী সামান্য বায়ুর আঘাতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোন সময় যৌবন নদী

সীমা লংঘন করে দু'কূল প্লাবিত করে। ঠিক তেমনি মানব জীবনের ভরা নদীতে প্রবৃত্তির দমকা হাওয়ায় তার যৌন তরংগ সীমা লংঘন করতে পারে। এটা অসম্ভবের কিছু নয়।

এখন যৌবনকে যেভাবে খুশী সেভাবে ব্যবহার করা, অথবা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা, এটাই এক মহা পরীক্ষা। যৌবন কাল মানুষের যেমন স্বর্নালী কাল তেমনি বিপদজনক কাল। যৌবনকালকে মানুষ তার দেহের ক্ষমতাকে যেখানে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে, অথবা সংযম, প্রেম-ভালবাসা, ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া-অনুগ্রহ বা অন্যান্য সৎ গুণাবলী দিয়ে সৎ পথে থেকে মানুষের সেবা যত্ন করতে পারে। এজন্যে যৌবন কালের মূল্য অপরিসীম। যুবক বয়সে আন্দোলন, সংগ্রাম করে একটা দেশকে যেমন ধ্বংস করে দেয়া যায় আবার সুন্দর রূপে গড়াও যায়।

মানুষ উপার্জন করেছে কোন পথে–এ প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অর্থ উপার্জন অর্থ ব্যয় ও অর্থ সম্পদের বন্টনের উপরে গোটা মানব সমাজের সুখ দুঃখ, উন্নতি-অবনতি নির্ভরশীল, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। একটা নিয়ম নীতির মাধ্যম দিয়ে অর্থ-সম্পদ আয় বা উপার্জন করা প্রয়োজন এবং তা ব্যয় করার ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট একটা নিয়ম নীতি অবলম্বন করা উচিত–এ কথা এক শ্রেনীর মানুষ মানতে চায় না। তারা মনে করে যে কোন উপায়ে অর্থ-সম্পদ অর্জন করা যেতে পারে।

সুদ-ঘুষ খেয়ে, অন্যকে ঠকিয়ে, জুয়া খেলে, মদের বা মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করে অথবা এমন ধরনের ব্যবসা করে যে ব্যবসার মাধ্যমে জাতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, অশ্লীল নোংরা বই লেখে, চরিত্র বিধ্বংসী অভিনয় করে, নগ্ন সিনেমা তৈরী করে, বেশ্যাবৃত্তি করে, অন্যায়ভাবে মানুষ বেচাকেনা করে, অর্থাৎ যে কোন পথে অর্থ উপার্জন করে ধনশালী হওয়া দিয়ে কথা, ন্যায় নীতি বা হালাল হারামের কোন প্রশ্ন নেই-এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে এক শ্রেনীর মানুষ অর্থ উপার্জন করে।

আবার অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রেও তারা কোন নিয়ম মানতে চায় না। যেমনভাবে খুশী তেমনভাবে ব্যয় করতে চায়। ধন-সম্পদ সমাজের, দেশের, গরীব মানুষের উপকারে আসতে পারে–এমন কাজে অর্থ ব্যয় না করে তারা অপ্রয়োজনীয় ভোগ বিলাসিতায় অর্থ ব্যয় করে। বাড়ীর পাশের মানুষ বা নিজের একজন গরীব আত্মীয় যিনি অভাবে আছেন, তাকে অর্থ সাহায্য না দিয়ে মদের পেছনে, নগ্ন অশ্লীল গান-বাজনার পেছনে, উদ্দেশ্যহীন খেলাধূলার পেছনে অর্থ ব্যয় করে।

কিন্তু একথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে, হাশরের ময়দানে কঠিনভাবে এর জন্যে জবাবদিহী করতে হবে। আল্লাহর দেয়া বিধান হচ্ছে, সৎপথে সদুপায়ে যেমন

প্রতিটি মানুষকে অর্থ উপার্জন করতে হবে, তেমনি সৎপথে ও সৎকাজেই তা ব্যয় করতে হবে। গরীব-দরিদ্র, অক্ষম, অসহায়, অন্ধ, আতুর, উপার্জনহীন আর্তমানুষকে দান করতে হবে। ধন-সম্পদ যেন অকেজো হয়ে শুধু পড়ে না থাকে অথবা তা অযথা ভোগ-বিলাসীতায় ব্যয় না হয়, সে ব্যাপারে চরম সর্তক থাকতে হবে।

এরপর প্রশ্ন করা হবে মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে। একজন লেখাপড়া না জানা মূর্খ মানুষের কথাই ধরা যাক, লেখাপড়া না জানলেও নিজের স্বার্থ সে ভালোভাবেই বোঝে এবং অর্থ-সম্পদ চেনে ঠিকই। পৃথিবীর জীবনে একজন লেখাপড়া না জানা মূর্খ মানুষের জমির বা অন্য কোন সম্পদ নিয়ে গোলযোগ দেখা দিলে সে সালিশের জন্যে দৌড়ায়, উকিলের কাছে যায়, মোকদ্দমা করে। এ সব স্বার্থের ক্ষেত্রে তার জ্ঞান ঠিকই থাকে–থাকেনা শুধু তার পালনকর্তা মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্ষেত্রে। জমা-জমির জন্য মূর্খ মানুষটা দুনিয়ার স্বার্থের টানে উকিলের কাছে ছুটে যায় কিন্তু পরকালের অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তি, আল্লাহকে জানার জন্য কোরআন–হাদীস জানা ব্যক্তির কাছে ছুটে যায় না। এ জন্যও তাকে কঠিন জবাব দিতে হবে। লেখাপড়া শিখতে পারিনি, কিছু বুঝতাম না–এ কথা বলে হাশরের ময়দানে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

আরেক শ্রেণীর মানুষ, যারা বহু অর্থ ব্যয় করে নানা বিদ্যা অর্জন করে। কিন্তু যে বিদ্যা অর্জন করলে নিজের স্রষ্টাকে জানা যাবে, সে বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন করে না। এরাও সেদিন ধরা পড়বে। আবার আরেক দল মানুষ, সবধরনের জ্ঞান অর্জন করে। কিন্তু জেনে বুঝেই ইসলামী বিধানের সাথে বিরোধিতা করে। এমন মানুষের অভাব নেই যারা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত–কিন্তু ইসলামী আইন মেনে চলে না। এ ধরনের সব মানুষকেই আল্লাহর নিকট জবাব দিতে হবে, সে তার জ্ঞানকে কিভাবে কোন কাজে ব্যবহার করেছে।

মানুষ কর্মফল অনুসারে তিন দলে বিভক্ত হবে

হাশরের ময়দানে বিচারের দিনে মানুষের কর্মফল অনুযায়ী তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহর আদালতের সামনে থাকবে একটি দল। ডান পাশে থাকবে একটি দল। বাম পাশে থাকবে একটি দল। পবিত্র কোরআন শরীফে এর একটা সুন্দর চিত্র দেখানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً-فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ-مَا اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ

وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ-مَا اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ-وَالسّٰبِقُوْنَ
السّٰبِقُوْنَ-اُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ-فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ-ثُلَّةٌ مِّنَ
الْاَوَّلِيْنَ-وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ-

সেদিন তোমরা তিনটি দলে বিভক্ত হবে। ডান পাশের দল। এ দলটির কথা কি বলবো? "বাম পাশের আরেকটি দল। এ দলটির দূর্ভাগ্যের কথা কি বলা যায়? আরেকটি দল হলো অগ্রবর্তী (বা সামনের) দল। এটা হলো সেই দল, যাদের মর্যাদা সর্বোচ্চে। তারাই তো সান্নিধ্যশালী লোক। তারা নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান ও বসবাস করবে। পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে বেশী সংখ্যক হবে। আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে কম সংখ্যক হবে। (সূরা ওয়াকেয়া ৭-১৪)

সামনের দলে তাঁরাই অবস্থান করবে যারা পৃথিবীতে আল্লাহও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় যাবতীয় বিপদ মুসিবত হাসি মুখে বরণ করেছেন। ইসলামী বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে যারা সবচেয়ে বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে যারা সবার আগে সাড়া দিয়েছেন।

সত্য বলার ক্ষেত্রে, দানের ক্ষেত্রে, মানুষের সেবা করার ক্ষেত্রে, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ক্ষেত্রে, ইসলামী বিধি বিধান সমাজে-দেশে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে, ইসলামী আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে যারা সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছে, তাঁরাই আল্লাহর আদালতের সামনের আসনে স্থান পাবে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে যে, একদিন আল্লাহর নবী তাঁর সাহাবাগণকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো কারা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহর (কুদরতের) ছায়ায় স্থান গ্রহণ করবে? সাহাবাগণ বললেন, তারা ওই সমস্ত লোক, যারা কোন প্রশ্ন ছাড়াই মহাসত্যকে গ্রহণ (অর্থাৎ ইসলামকে গ্রহণ করে তা মান্য করে চলে) করে। তারা নিজেদের জন্যে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অন্যের ক্ষেত্রেও সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পবিত্র কোরআনে সূরা ওয়াকিয়ায় এই অগ্রবর্তী দল সম্পর্কে সূরা ওয়াকেয়ায় বলা হয়েছে–

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ-مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ-يَطُوْفُ
عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ-بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ-وَكَاْسٍ مِّنْ
مَّعِيْنٍ-لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَايُنْزِفُوْنَ-وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا

يَتَخَيَّرُوْنَ-وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ-وَحُوْرٌ-عِيْنٌ-كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِالْمَكْنُوْنِ-جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-لاَيَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلاَ تَأْثِيْمًا-اِلاَّ قِيْلاً سَلٰمًا سَلٰمًا-

তারা বালিশে হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে মহামূল্যবান সিংহাসনে বসবে তাদের আশে পাশে চির কিশোরের দল ঘুরে ফিরে আনন্দ পরিবেশন করবে তাদের হাতে থাকবে পানীয় পাত্র। পান পাত্র ও ঝর্ণা থেকে আনা পরিশুদ্ধ সূরা ভরা পেয়ালা। এ সূরা পান করে না মাথা ঘুরবে না জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে। এবং চির কিশোরেরা তাদের সামনে পরিবেশন করবে বিভিন্ন উপাদেয় ফলমূল, যেন তার মধ্যে যা মন চায় তা তারা গ্রহণ করতে পারে। উপরন্তু তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে বিভিন্ন পাখীর সুস্বাদু গোশ্‌ত। ইচ্ছা অনুযায়ী তারা তা খাবে। তাদের জন্যে নির্ধারিত থাকবে সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট অপরূপ অপসরী। তাদের সৌন্দর্য হবে সযত্নে রক্ষিত মণি-মুক্তার ন্যায়। পূণ্যফল হিসেবে তারা তা লাভ করবে সে সব সৎকাজের বিনিময়ে যা তারা পৃথিবীতে করেছে। সেখানে তারা শুনতে পাবে না কোন অনর্থক বাজে গালগল্প। অথবা কোন পাপ চর্চা অসদালাপ। তাদের কথাবার্তা আলাপ আলোচনা হবে শালীনতাপূর্ণ। থাকবেনা তার মধ্যে কোন প্রগলভতা। তাদেরকে শুধু, এই বলে সম্বোধন করা হবে, আপনাদের প্রতি সালাম।

এই সূরায় যে অল্প বয়স্ক বালক বা চির কিশোরদের কথা বলা হয়েছে তারা অনন্তকাল ধরে এমনি কিশোরই থাকবে। তারা কোন দিনই যৌবন লাভ করবেনা বা বৃদ্ধ হবে না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) বলেন যে, এরা ওই সমস্ত বালক যারা সাবালক হবার পূবেই ইন্তেকাল করেছিল। এদের কোন পাপ-পূণ্য ছিল না। এরা কোন শাস্তিও পাবেনা।

এসব চির কিশোররা এমন সব লোকের সন্তান হবে যারা জান্নাতে যাবার যোগ্যতা অর্জন করেনি। কেননা জান্নাতবাসীদের নিস্পাপ সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–তাদের সন্তানদেরকে তাদের সঙ্গে জান্নাতে মিলিত করবেন। জান্নাতবাসীদের নিস্পাপ সন্তানগণই শুধু নয়– তাদের বয়স্ক সন্তানদের মধ্যে যারা জান্নাতে যাবে তাদেরকেও মাতা-পিতার সঙ্গে জান্নাতে একত্রে বসবাসের সুযোগ দেয়া হবে। (সূরা তুর-২১)

হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালতের ডান পাশের দল সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ-مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ-فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ-وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ-وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ-وَّمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ-وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ-لَّامَقْطُوْعَةٍ وَّلَامَمْنُوْعَةٍ-وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ-اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاءً-فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا-عُرُبًا اَتْرَابًا-لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ-

এরা লাভ করবে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছায়াযুক্ত কন্টকহীন কুল ও ফলবাগান আর সর্বদা প্রবাহিত পানির ঝর্ণাধারা ও অফুরন্ত ফলমূল। এ সকল ফলমূল সকল মৌসুমেই পর্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যাবে এবং তা লাভ করবে ও তার স্বাদ লাভ করতে কোন বাধা বিপত্তি থাকবে না। তারা উচ্চ আসনে সমাসীন থাকবে। তাদের স্ত্রীদেরকে নতুন করে গঠন করা হবে। তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেয়া হবে। তারা হবে প্রেমদায়িনী। তাদের বয়স হবে সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হবার বয়স। এ সবকিছু ডান পাশের মানুষের জন্যে। (সূরা ওয়াকেয়া, ২৭-৩৮)

সেদিন আল্লাহই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন

মাহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনএ গোটা বিশ্বজগতের স্রষ্টা। এই বিশ্বে বা এর বাইরেও যা কিছু রয়েছে, সেসব কিছুরই একমাত্র মালিক তিনি। আখিরাতের ময়দানেরও মহান মালিক তিনিই। পরকালে কার ব্যাপারে তিনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন-সে ক্ষমতা শুধু তারই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ-يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ-

সেদিন (কিয়ামতের দিন) একচ্ছত্র ক্ষমতা শুধু মহান আল্লাহর। তিনিই মানুষের ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। (সূরা হজ্ব-৫৬)

অর্থাৎ হাশরের ময়দানে শতশত কোটি মানুষের বিচার কার্য পরিচালনার জন্যে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্যে, কারো কোন সাহায্য বা কারো কোন পরামর্শের প্রয়োজন আল্লাহর নেই। তিনি নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সর্বজ্ঞ। প্রতিটি মানষের প্রকাশ্য ও গোপন কর্মকান্ড সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন তদুপরি ন্যায় ও ইনছাফ প্রদর্শনের জন্য মানুষের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন কর্ম পুংখানুপুংখরূপে তাঁর নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে আমলনামায় রেকর্ড বানিয়ে রেখেছেন।

এ আমলনামা ফেরেশ্তাগণ লেখেন। তাদের কোন ভুল হয় না। ভুল-ভ্রান্তি ও পাপ করার প্রবণতা তাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাই বলে মহান আল্লাহ ফেরেশতা কর্তৃক

লিখিত আমলনামার উপরে নির্ভরশীল নন। কারণ ফেরেশতাগণ অদৃশ্যে কি ঘটছে, মানুষ কি চিন্তা করে, ইশারা ইঙ্গিতে পরস্পরে কি বলে, এসব তারা জানতে পারেন না। মানুষ ভবিষ্যতে কি করবে, সে সম্পর্কে ফেরেশতাদের জ্ঞান নেই। কিন্তু আল্লাহর নিকট বর্তমান, ভবিষ্যত ও অতীত বলে কিছু নেই। মানুষ ভবিষ্যতে কি করবে তার বর্তমানরূপ তার সামনে উপস্থিত থাকে।

সুতরাং, ফেরেশ্তাদের লিখিত আমলনামা ছাড়াই তিনি তার সঠিক জ্ঞান দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। কিন্তু ন্যায় ও ইনছাফের দৃষ্টিতে এবং মানুষের বিশ্বাসের জন্যে আমলনামা লেখার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। অন্য আল্লাহর উপর প্রভাব বিস্তার করবে, সুপারিশ করে আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাতে পারবে এ ধরনের বিশ্বাস যারা মনে স্থান দেবে তারা আর যা-ই হোক অবশ্যই মুসলমান নয়। সুতরাং বিচারের দিনে কোন পীর, ওলী, মাওলানার পরামর্শ বা সুপারিশ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন আল্লাহর নেই।

সেদিন কারো সুপারিশ করার অধিকার থাকবে না

মহান আল্লাহ বলেন-

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَّ لاَشَفَاعَةٌ-

সেদিন (হাশরের দিন) আসার পূর্বে-যেদিন না লেন-দেন হবে, না বন্ধুত্ব উপকারে আসবে, আর না চলবে কোন সুপারিশ। (সূরা বাকারাহ্-২৫৪)

সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ-

কে এমন আছে যে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে?

কিন্তু পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক মানুষের ধারণা এবং বিশ্বাস যে, এমন কিছু পীর, মাওলানা, ওলী আছেন যাঁরা হাশরের ময়াদানে তাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সুপারিশ অনুযায়ী তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে পাঠাবেন। যারা বিশ্বাস করে অমুক 'বাবা' অমুক 'পীর' অমুক 'ওলী' কিয়ামতের ময়দানে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে, তারা আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করার চেয়ে তথাকথিত 'সুপারিশ কারীদের' কাছে বেশী ধর্না দেয়। কারণ তারা মনে করে ওই ব্যক্তি আল্লাহর খুব কাছের, আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি, আল্লাহর উপর ওই ব্যক্তির সাংঘাতিক প্রভাব। এই ধরণের বিশ্বাসে বিশ্বাসী

হয়ে এক শ্রেণীর মানুষ নিজের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে পৃথিবীর ভোগ-বিলাস থেকে দূরে সরে আল্লাহর আইন মেনে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে–ওই সমস্ত মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে, যাদেরকে তারা সুপারিশকারী হিসেবে বিশ্বাস করে। তাদের সন্তুষ্টির জন্যে নযর নিয়ায দান করা, তাদের নামে গরু, খাসী, মুরগী, নগদ টাকা মানত করা, তাদের কবরে ফুল, মিষ্টি, গোলাপ পানি, মোমবাতি, আগরবাতি, কবরে শায়িত ব্যক্তির নামে ওরশ করা-নিজেরা এগুলো অতি উৎসাহের সাথে করে এবং অপরকেও করতে উঃসাহ দান করে। তাদের বিশ্বাস এসব করলে তিনি হাশরের মাঠে তার জন্য সুপারিশ করবেন।

আল্লাহর দেয়া বিধান ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবেই এক শ্রেণীর মানুষ ওই ধরণের ভুল করে থাকে। কিছু মানুষের ধারণা মৃত্যুর পরে যদি সত্যই কোন জীবন থেকেই থাকে, তাহলে সে জীবনে সহজে মুক্তি পাবার উপায় কি? এ প্রশ্ন যখন তাদের মনে জাগে তখন শয়তান এসে কুমন্ত্রণা দেয়, 'অমুক মাজারে গিয়ে সেজদা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করো। তিনি পরকালে তোমার জন্যে সুপারিশ বা শাফায়াত করবেন।'

শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুযায়ী তারা দল বেঁধে আল্লাহর ওলীদের মাজারে গিয়ে এমন ভক্তি শ্রদ্ধা ও আবেদন নিবেদন জানায়, যে আবেদন নিবেদন জানানো উচিত ছিল মহান আল্লাহর দরবারে। ওই হতভাগা মানুষগুলো একথা বুঝতে চায় না, তাদের আবেদন-নিবেদন কবরের ওই মানুষটি শুনতে পারছে না। শুধু তাই নয় কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যখন তার ওলীদের জানিয়ে দেবেন, 'তোমাদের মাযারকে কেন্দ্র করে ওই মানুষগুলো এই এই কাজ করেছে।' তখন ওলীগণ ওই হতভাগাদের আচরণের কারণে চরম অসন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা জীবিত অথবা মৃত মানুষকে নিজের প্রভু বানিয়ে নেয় অথবা তাদেরকে আল্লাহর শরীক বানায় তাদের জন্যে অভিশাপ ছাড়া কোন বুজুর্গ-ওলীর পক্ষ থেকে দোয়া বা সুপারিশের আশা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বর্তমান পৃথিবীতে কিছু মানুষ তাদের দরবারে যাতায়াত করে তাদের মধ্যে ওই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাই বেশী–সমাজে যারা অসৎ হিসেবে চিহ্নিত। এই অসৎ দুষ্কৃতিকারী মানুষগুলো প্রকৃত ইসলামের অনুসারী না হয়ে ছুটে যায় এক শ্রেণীর পীরদের দরবারে বা মাজারে। তাদের বিশ্বাস পরকালে তার পীর সাহেব আল্লাহর দরবারে তাদের জন্যে সুপারিশ করে তাদের নাজাতের ব্যবস্থা করে দেবেন। এ

আশায় তারা তাদের পীর সাহেবকে নানা ধরণের মূল্যবান উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। একথা অবশ্যই সত্য যে, কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে যে সমস্ত ব্যক্তিগণকে শাফায়াত বা সুপ্যারিশ করার অনুমতি দিবেন-তারা অবশ্যই ও সমস্ত মানুষ, পৃথিবীতে জীবিত থাকতে যারা নবী এবং তার সাহাবাগণের ন্যায় জীবন-যাপন করেছেন–এরা আল্লাহর ওয়াদা অনুসারে জান্নাতি হবেন। পক্ষান্তরে কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তির নিজেরই মুক্তির কোন আশা নেই, সেই ব্যক্তি আরেকজনের জন্যে সুপরিশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে কি করে? সত্যিকারের যারা পীর, যারা ওলী তাদের জীবন-যাপনের ধরণ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবাগণের ন্যায়। তারা সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকেন। সত্যিকারের পীর-ওলী জেল-জুলুম পরোয়া করেন না। কোন দুষ্কৃতিকারী, সূদখোর, ঘুষখোর, কালোবাজারি, জেনাকার মদ্যপ পীর-ওলীদের বন্ধু হতে পারে না। কিয়ামতের দিন দুষ্কৃতিকারী অসৎ লোকদের কোন বন্ধুও থাকবে না, কোন সুপারিশকারীও থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ–

অন্যায় আচরণকারীদের জন্যে (হাশরের দিন) কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও থাকবে না এবং থাকবেনা কোন সুপারিশকারী যার কথা শুনা যাবে। (সূরা মুমিন-১৮)

বর্তমানে কিছু সংখ্যক নামধারী তথাকথিত পীর-ওলীদের দরবারে ওই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের দেখা যায়-যারা প্রচুর কালোটাকার মালিক। এই তথাকথিত পীরগণ ওই দুষ্কৃতিকারীগণের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা না করে তাদের কাছ থেকে শুধু নযরানাই গ্রহণ করে। এদের নিজেদের নাজাত তো মিলবেইনা বরং অপরাধী ও দুষ্কৃতিকারীদের প্রশ্রয় দেয়ার কারণে পরকালে শাস্তিরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এই ধরণের ভন্ড অর্থলোভী পীর, মাওলানাদের সম্পর্কে সূরা বাকারার ১৬৬-১৬৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ–وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا–كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ–وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ–

(কিয়ামতের দিন) ওই সব ব্যক্তি পৃথিবীতে যাদেরকে অনুসরণ করা হতো, (তারা) তাদের অনুসারীদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করবে কিন্তু তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং তাদের মধ্যকার সব ধরণের সম্পর্ক ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যারা এসব ব্যক্তিদের অনুসরণ করেছিল তারা বলবে হায়রে, যদি পৃথিবীতে আমাদেরকে একটিবার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ যেভাবে এরা আমাদের প্রতি তাদের অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করছে, আমরাও তাদের প্রতি আমাদের বিরক্তি দেখিয়ে দিতাম। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে তাদের কৃত কর্মকান্ড এভাবে উপস্থিত করবেন যে, তারা দুঃখ ও অনুশোচনায় কাতর হয়ে পড়বে। কিন্তু জাহান্নামের আগুন থেকে তারা বের হবার পথ পাবে না।

পূর্ববর্তী উম্মতের ধর্মীয় নেতাগণ অর্থ উপার্জনের লোভে মানুষকে ধর্মের নামে আল্লাহ-রাসূলের পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে যেত। তারা নিজেদের মুরীদদেরকে সত্যিকারের মুক্তির পথ না দেখিয়ে মুরীদদের কাছ থেকে নয়র-নেয়াজ গ্রহণ করে নিজেদের মনগড়া পথে পরিচালিত করতো। সূরা তওবায় এ ধরনের পীর, দরবেশ আলেমদের সম্পর্কে সূরা তওবার ৩৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

(আহলে কিতাবদের) অধিকাংশ আলেম, পীর, দরবেশ-অবৈধ উপায়ে মানুষের অর্থ-সম্পদ ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখে।

এসব অর্থলোভী পথভ্রষ্ট পীর, আলেম নামধারী যালেমগণ তাদের ধর্মীয় সিংহাসনে বসে ফতোয়া বিক্রি করে। তারা সত্যিকারের দ্বিনদার, পহেজগার আলেম, ওলামা, পীর, মাশায়েখদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়। এদেরই কারণে সত্যিকারের পীরগণ সমাজে মর্যাদা পায় না। কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ বা শাফায়াত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করে কোরআন ও হাদীস প্রকৃত ঘটনা মানুষের সামনে পেশ করেছে। সেদিন সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী হবেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট মহামানব, মানুষের মুক্তির দিশারী, নবী সম্রাট, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেও কিছু নেক মানুষ অন্যের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবে। এই সুপারিশ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। যারা সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবে–তারা হলো ওই

সমস্ত ব্যক্তি, যারা পৃথিবীতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে চরম কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা, সহ্য করেও ইসলামের আদেশ-নিষেধ পালনে সদাসর্বদা তৎপর ছিলেন। তারা আল্লাহর নিকট কোন অন্যায় আবদার করবেন না। কোন দুষ্কৃতিকারীর জন্যে তারা সুপরিশ করবেন না। সুপারিশ তাদের জন্যেই করবেন–পৃথিবীতে যারা ইসলামের আদেশ-নিষেধ পালন করে চলেছে বটে কিন্তু সামান্য ভুল ভ্রান্তিও করেছেন। তবুও শাফায়াতের পুরো ব্যাপারটা মহান আল্লাহর মর্জি মোতাবেক হবে।

শাফায়াতের সমগ্র ব্যাপারটি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকবে

পবিত্র কোরআনে সূরা যুমার-এর ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا–

(হে রাসূল) বলে দিন, শাফায়াতের সমগ্র ব্যাপারটি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে।

মহান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো জন্য শাফায়াত করতে পারবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ–

তাঁর অনুমতি ব্যতিত কে তাঁর নিকট শাফায়াত করবে? (সূরা বাক্বারাহ্-২৫৫)

যে ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ অন্য কাউকে শাফায়াত করার অনুমতি প্রদান করবেন, সে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছে মতো শাফায়াত করা দূরে থাক–আল্লাহর সামনে মুখ খুলতেই পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَ يَشْفَعُوْنَ–اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى–

যাদের উপর আল্লাহ খুশী হয়েছেন তারা ব্যতিত আর কারো জন্যে শাফায়াত করা যাবে না। (সূরা আম্বিয়া-২৮)

সুপারিশকারী যা সুপারিশ করবে তা হবে সকল বিচারে সত্য ও ন্যায় সঙ্গত। সূরা আন্ নাবা-এর ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لاَيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا–

করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাদেরকে অনুমতি দিবেন তারা ব্যতিত আর কেউ কোন কথা বলতে পারবেনা এবং তারা যা কিছু বলবে তা ঠিক ঠিক বলবে।

যারা সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবে তারা নির্দিষ্ট শর্ত অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে একটা সীমারেখার ভেতরে সুপারিশ করবে। আর এই সুপারিশের ধরণ

সাধারণ কোন সুপারিশের মতো হবে না। আল্লাহর নিকট সুপারিশের ধরনও হবে ইবাদত ও বন্দেগীর ন্যায়। মানুষ আল্লাহর কাছে যে পদ্ধতিতে নিজের পাপের ক্ষমা চায় অর্থাৎ কান্নাকাটি, অনুনয়-বিনয় এবং অত্যন্ত দীনহীন ভঙ্গিতে-তেমনি ভঙ্গিতে শাফায়াতকারী শাফায়াত করবে। তবে শাফায়াতের এই ধরণ আল্লাহর রাসূলের জন্য প্রজোয্য নয়। কারণ তার মর্যাদা আল্লাহর নিকট সবেচেয়ে বেশী। তিনি কি ভঙ্গীতে আল্লাহর দরবারে উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন সেটা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় বন্ধু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যেকার ব্যাপার। যিনি সুপারিশ করবেন তার মনে কখনো এ ধারণা জন্মাবেনা যে, তাঁর সুপারিশের কারণে আল্লাহ তার নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। পরম মেহেরবান আল্লাহর অনুগ্রহসূচক অনুমতি পাবার পরে সুপারিশকারী অত্যন্ত দীনতা, হীনতা ও বিনয় সহকারে অনুনয় করে বলবে, 'হে দুনিয়া ও আখিরাতের মহান মালিক আল্লাহ! তুমি তোমার অমুক বান্দাহর গুনাহ ও ভুল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। তাকে তোমার অনুগ্রহ ও রহমত দান করে ধন্য করো।'

সুতরাং সুপারিশ করার অনুমতিদানকারী যেমন আল্লাহ তেমনি তা কবুলকারীও আল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন–

لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ–

তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত তাদের জন্যে না আর কেউ ওলী বা অভিভাবক আছে, আর না কেউ শাফায়াতকারী। (সূরা আনয়াম-৫১)

শাফায়াতকারী তারাই হবেন যারা আল্লাহর অতি প্রিয়। আর যাদের জন্যে শাফায়াত করা হবে তাদের পাপের অবস্থা এই যে, পাপ ও নেকীর ক্ষেত্রে তাদের পাপ সামান্য বেশী। অর্থাৎ ক্ষমা পেয়েও যেন ক্ষমা না পাওয়ার অবস্থা, ক্ষমার যোগ্যতা লাভে সামান্য অভাব। এই অভাবটুকু পুরণের জন্যেই মহান মালিক আল্লাহর রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে তাদের জন্যে শাফায়াত করার অনুমতি দান করবেন। সুতরাং একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কারো ইচ্ছে অনুযায়ী কেউ কারো পক্ষে সুপারিশ করতে পারবে না। যাদের জন্য সুপারিশ করা হবে তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে ক্ষমা করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই কাউকে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন। এখানে একটা প্রশ্ন জাগে, সুপারিশ করার অনুমতিদান করবেন আল্লাহ, আবার তা কবুলও করবেন তিনি। তাহলে সুপারিশকারী নিয়োগ করার যুক্তিটা কী? এর জবাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কিয়ামতের ময়দানে সেই মুসিবতের দিনে, যে

মুসবিতের মহাবিভীষিকা দেখে সাধারণ মানুষের অবস্থা যে কি হবে তা কল্পনারও বাইরে-স্বয়ং কোন কোন নবীগণও ভয়ে কাঁপতে থাকবেন এবং আল্লাহর সামনে কোন কথা বলার সাহস পাবেন না। সেই অবস্থায় আল্লাহ তার কিছু প্রিয় বান্দাহদেরকে শাফায়াত করার অনুমতি প্রদান করে তাদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করবেন। এই মর্যাদার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান পাবার অধিকারী হবেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তবে এ কথাও সত্য-মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চললেই যে, সে কিয়ামতের ময়দানে জান্নাত পাবে এ ধারণা করা উচিত নয়। বরং মনের আকাংখা এটাই হওয়া উচিত, 'জান্নাতের লোভ নেই জাহান্নামেরও ভয় নেই-চাই শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি।' সুতরাং, আল্লাহর রহমত ছাড়া মুক্তি পাওয়া যাবে না। সূরা নাবা-এর ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا-لَاَيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا-

সেদিন সকল আত্মা ও ফেরেশতাগণ কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়াবে কেউ কোন কথা বলবেনা সে ব্যতীত, যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দিবেন। এবং যথাযথ ও সঠিক কথা সে বলবে।

বিচার দিবস হিসাব গ্রহণ ও প্রতিফল লাভের দিন

কিভাবে সেই বিচার দিবস সংঘটিত হবে এবং তোমরা তখন কি বলবে শোন-

فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ-وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ-هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ

শুধুমাত্র একটি বিকট ধমক দেয়া হবে এবং সহসাই এরা নিজের চোখে (পরকালের ঘটনাসমূহ) দেখতে থাকবে। সে সময় এরা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এতো প্রতিফল দিবস-'এটা সে ফায়সালার দিন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে'। (আস্ সা-ফ্ফাত-১৯-২১)

পৃথিবীতে মানুষ যেভাবে ঘুমিয়ে থাকে, মৃত মানুষগুলো সেই অবস্থাতেই থাকবে। মহান আল্লাহর আদেশে এমন ধরনের ভয়াবহ শব্দ করা হবে যে, সমস্ত মানুষগুলো একযোগে উত্থিত হবে। সমস্ত ঘটনাবলী তারা নিজেদের চোখে যখন দেখবে, তখন আর সন্দেহ থাকবে না যে, এটাই সেই দিন, যেদিনের কথা নবী-রাসূল,

আলেম-ওলামা পৃথিবীতে বলেছে। তখন তারা পরস্পরে বলবে অথবা নিজেদেরকেই শোনাবে, এই দিনটি সম্পর্কে তোমরা মিথ্যা ধারণা পোষণ করতে। কত বড় হতভাগা তোমরা, যে পূঁজি থাকলে আজকের এই দিনে মুক্তিলাভ করা যেতো, সে পূঁজি তো আমাদের নেই।

উল্লেখিত আয়াতেও 'ইয়াও মুদ্দিন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং যার অর্থ প্রতিফল দিবস। ইবলিস শয়তান যখন আল্লাহর আদেশ পালন না করে বিতর্ক করেছিল, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলেছিলেন–

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ–

প্রতিদান দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি আমার অভিশাপ। (সূরা সা-দ–৭৮)

এ আয়াতেও ইয়াও মিদ্দীন শব্দ ব্যবহার করে প্রতিদান দিবসকেই বুঝানো হয়েছে। সূরা ইনফিতারে তিনটি আয়াতে ঐ একই শব্দ ব্যবহার করে বিচার দিবস তথা প্রতিফল দিবসকে বুঝানো হয়েছে। বিচার দিবসে বিদ্রোহীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকে তারা মুহূর্ত কালের জন্যও বের হতে পারবে না। ঐ দিনটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা প্রশ্নাকারে বলেছেন–

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ–وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ–وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ–ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ–يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا–وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ–

বিচারের দিন তারা তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে কক্ষণই অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। আর তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি? আবার (প্রশ্ন করি) তুমি কি জানো সেই বিচারের দিনটি কি? সেটা ঐ দিন, যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না। সেদিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ারে থাকবে। (সূরা ইনফিতার-১৫-১৯)

সবাই সেদিন কৃতকর্মের বিনিময় লাভ করবে

পৃথিবীতে মানুষের অবস্থা হলো, এদের মধ্যে অনেকে গুরুতর অপরাধ সংঘটিত করে। অর্থ, ক্ষমতা আর প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে অপরাধ করেও সমাজে সম্মান ও মর্যাদার আসন দখল করে বসে থাকে। বিচার পর্বের কাজে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে। ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে সুপারিশ করিয়ে জেল-জরিমানা থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু বিচার দিবসে কেউ কারো পক্ষে সুপারিশ

করার চিন্তাও করতে পারবে না। পরিস্থিতি এমনই ভয়াবহ আকার ধারণ করবে যে, প্রতিটি মানুষ নিজের চিন্তায় উন্মাদের মতই হয়ে পড়বে। ঘটনার আকস্মিকতা আর আসন্ন বিপদের গুরুত্ব অনুধাবন করে মানুষ মাতালের মতই হয়ে পড়বে। পৃথিবীতে যে একান্ত আপনজন ছিল, যাকে এক মুহূর্ত না দেখে থাকা যায়নি, তার দিকে তাকানোর প্রয়োজনও সে অনুভব করবে না। নিজে পৃথিবীতে যা করেছিল, তার কি ধরনের প্রতিফল সে লাভ করতে যাচ্ছে, এ চিন্তাতেই সে বিভোর হয়ে থাকবে আর মনে মনে বলতে থাকবে, আজকের এদিনটি যদি কখনো না হতো–তাহলে কতই না ভালো হতো। মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا-وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ-تَوَدُّلَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا-

সেদিন নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের বিনিময় লাভ করবে, সে ভালো কাজই করুক আর মন্দ কাজই করুক। সেদিন প্রত্যেকেই এই কামনা করবে যে, এই দিনটি যদি তার কাছ থেকে বহুদূরে অবস্থান করতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। (সূরা আল ইমরাণ-৩০)

অবিশ্বাসীরা বিচার দিবস সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে। এরা বলে বিচার দিবস হবে কি হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং সন্দেহপূর্ণ একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নিজেকে বঞ্চিত করো না। সামনে যেভাবে যা আসছে, যা পাচ্ছো, তা ভোগ করে নাও। বিচার দিবসে এদেরকে যখন উঠানো হবে এবং যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, সে সম্পর্কে এরা কোনদিন কল্পনাও করেনি। অকল্পিত বিষয় যখন বাস্তবে দেখতে পাবে, তখন এরা নিজেদের নিকৃষ্ট পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে তা থেকে মুক্তি লাভের আশায় কি করবে, এ সম্পর্কে সূরা যামার-এ মহান আল্লাহ বলছেন–

وَلَوْاَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِى الاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَه لاَفْتَدَوْا بِه مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ-وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ-وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاتُ مَاكَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِه يَسْتَهْزِءُوْنَ-

এসব জালিমদের কাছে যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদরাজি এবং তাছাড়াও আরো অতটা সম্পদ থাকে তাহলে কিয়ামতের ভীষণ আযাব থেকে বাঁচার জন্য তারা মুক্তিপণ

হিসাবে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু তাদের সামনে আসবে যা তারা কোনদিন অনুমানও করেনি। সেখানে তাদের সামনে নিজেদের কৃতকর্মের সমস্ত মন্দ ফলাফল প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর যে জিনিস সম্পর্কে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো তা-ই তাদের ওপরে চেপে বসবে।

বিচার দিবসের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন অসংখ্য যুক্তি উপস্থাপন করেছে। এমন একটি সময় অবশ্যই আসা উচিত যখন জালিমদেরকে তাদের জুলুমের এবং সৎ কর্মশীলদেরকে তাদের সৎকাজের প্রতিদান দেয়া হবে। যে সৎকাজ করবে সে পুরস্কার লাভ করবে এবং যে অসৎকাজ করবে সে শাস্তি লাভ করবে। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এটা চায় এবং এটা ইনসাফেরও দাবি। এখন যদি মানুষ দেখে, বর্তমান জীবনে প্রত্যেকটি অসৎলোক তার অসৎকাজের পরিপূর্ণ সাজা পাচ্ছে না এবং প্রত্যেকটি সৎলোক তার সৎকাজের যথার্থ পুরস্কার লাভ করছে না বরং অনেক সময় অসৎকাজ ও সৎকাজের উল্টো ফলাফল পাওয়া যায়, তাহলে মানুষকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, যুক্তি, বিবেক-বুদ্ধি ও ইনসাফের এ অপরিহার্য দাবি একদিন অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। সেদিনের নামই হচ্ছে বিচার দিবস বা আখিরাত। বরং আখিরাত সংঘটিত না হওয়াই বিবেক ও ইনসাফের বিরোধী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ-اُولٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ-وَالَّذِيْنَ سَعَوْفِىْ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ

আর এ কিয়ামত এ জন্য আসবে যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে তাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন, তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিয্ক। আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা সাবা-৪-৫)

সেদিন মানুষকে এককভাবে জবাবদিহি করবে

বিচার দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে। পৃথিবীতে মানুষের কত আপনজন থাকে, শুভাকাংখী থাকে, অসংখ্য পরিচিতজন ও বন্ধু থাকে। একজন বিপদাপন্ন হলে আরেকজন তাকে সাহায্য করতে দৌড়ে আসে। আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা হলে যামিন নিতে গেলে বা হাজিরা দিতে

গেলে তার সাথে কেউ না কেউ যায়। কিন্তু আল্লাহর আদালতে সে কাউকে সঙ্গী হিসাবে পাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে একাকী জবাবদিহি করতে হবে। তার কৃতকর্মের সাফাই আরেকজন গাইবে, এমনটি সেখানে হবে না। আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ-وَمَا نَرى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُا-لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ-

(বিচার দিবসের দিন আদালতে আল্লাহ বলবেন) নাও, এখন তোমরা ঠিক তেমনিভাবে একাকীই আমার সামনে উপস্থিত হয়েছো, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার একাকী সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে আমি পৃথিবীতে যা কিছু দান করেছিলাম, তা সবই তোমরা পিছনে রেখে এসেছো। এখন আমি তোমাদের সাথে সেসব পরামর্শ দাতাগণকেও তো দেখি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা ধারণা করেছিলে যে, তোমাদের কার্যোদ্ধারের ব্যাপারে তাদেরও অংশ রয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তোমরা যা কিছু ধারণা করতে, তা সবই আজ তোমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছে। (সূরা আন'আম-৯৪)

পৃথিবীতে মানুষ অসংখ্য সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে নেয়। বৈধ-অবৈধ পথে সে সম্পদের পাহাড় রচিত করে তবুও সম্পদ আহরোণের নেশা যায় না। এসব ত্যাগ করে যেতে হবে, সেদিন এসব কোনই কাজে আসবে না। যারা সৎকাজ করেছে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনা করেছে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই রব্ব হিসাবে অনুসরণ করেছে, কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গী হবে তাদের কৃত সৎকাজসমূহ। কোন বিপদ দেখা দিলে বা কোন কামনা-বাসনা পূরণের আশায় মানুষ পীর-দরবেশ-মাজার-ফকিরের কাছে ধর্ণা দিয়ে মনে করতো, এরা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে, তার মনের কামনা পূরণ করতে পারে, তাকে ধনবান বানিয়ে দিতে সক্ষম, বিচার দিবসে সুপারিশ করতে সক্ষম, সেদিন তারা কেউ কোন সাহায্য করতে পারবে না।

আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে যেসব নেতা-নেত্রীরা মানুষকে ভাতের অধিকার, ভোটের অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তির অধিকারের লোভ দেখিয়ে পরামর্শ দিতো যে, তাদেরকে সহযোগিতা করা হোক, যারা এসব প্রতারণামূলক

কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে ঐসব নেতা-নেত্রীদের পেছনে ছুটেছে, তাদেরকে যখন আল্লাহর আদালতে উপস্থিত করা হবে, তখন আল্লাহ প্রশ্ন করবেন–তোমাদেরকে যারা পরামর্শ দিতো, তাদেরকে তো আজ দেখা যাচ্ছে না। তারা সবাই আজ সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

মানুষ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি স্বতন্ত্র নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর সামনে এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ব্যক্তিগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তার সাথে অংশীদার নেই। পৃথিবীতে যতই অধিক সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ, বিপুল সংখ্যক জাতি, দল ও গোষ্ঠী বা বিপুল সংখ্যক সংগঠন একটি কাজে বা একটি কর্মপদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করুক না কেন, বিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে তাদের এ সমন্বিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত দায়িত্ব পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হবে এবং তার যা কিছু শাস্তি বা পুরস্কার সে লাভ করবে তা হবে তার সেই কর্মের প্রতিদান–যা করার জন্য সে নিজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়ী বলে প্রমাণিত হবে। এ ইনসাফের মানদন্ডে অপরের গর্হিত কর্মের বোঝা একজনের ওপর এবং তার গোনাহের বোঝা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকবে না। সুতরাং মানুষের জন্য জ্ঞান-বিবেক ও বুদ্ধির পরিচয় হলো এটাই যে, আরেকজন কি করছে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিজের কর্ম কতটুকু গ্রহণযোগ্য, তার দিকে দৃষ্টি দেয়া। যদি তার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বের সঠিক অনুভূতি থাকে, তাহলে অন্যেরা যাই করুকনা কেন, সে নিজের সাফল্যের সাথে আল্লাহর সামনে যে কর্মধারার জবাবদিহি করতে পারবে তার ওপরই অটলভাবে দন্ডায়মান থাকা। মহান আল্লাহ বলেন–

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ–وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا–وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى–

যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, তার সৎপথ অবলম্বন তার নিজের জন্যই কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, তার পথভ্রষ্টতার ধ্বংসকারিতা তার ওপরেই বর্তায়। কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল–১৫)

ময়দানে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে, যারা মনে করে–'আমরা ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত কবুল করে ইসলামের দল ভারী করলাম। কারণ সমাজে আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি

রয়েছে, লোকজন আমাদেরকে গুরুত্ব দেয়, সম্মান করে, মর্যাদা দেয়।' এদের মনোভাব এ ধরনের যে, তারা ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে যেন ইসলামের প্রতি করুণা করেছে। এরা আন্দোলনে শামিল না হলে, ইসলাম কোনদিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। এ ধরনের চিন্তা-চেতনা নিয়ে যারা ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়, তাদের অনুধাবন করা উচিত–কেউ আল্লাহর রবুবিয়াত কবুল করে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হলে, এতে তার নিজেরই কল্যাণ হবে। অন্য কেউ তার কল্যাণে অংশ নিতে পারবে না। সে সৎপথ লাভ করলো, এ জন্য আল্লাহর দরবারে বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কেননা আদালতে আখিরাতে তার ব্যাপারে তাকে একাই জবাবদিহি করতে হবে, অন্য কেউ তার অবস্থা পরিবর্তন করে দিতে পারবে না। আল্লাহ বলেন–

مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَإٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ–

সেদিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টাকারীও কেউ থাকবে না। (সূরা আশ শূরা-৪৭)

সেদিন কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হবে না

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যা করছে এবং বলছে, তার সবকিছুই তিনি দেখছেন এবং শুনছেন। তিনি কোন কিছুই ভুলে যাবেন না। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত শেষ যে মানুষটি জন্ম নেবে, অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষের বলা কথা ও কর্ম সম্পর্কে তিনি অবগত থাকবেন। তাঁর জানার ভিত্তিতে তিনি সমস্ত মানুষের বিচার করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু তিনি তা করবেন না–মানুষ যেন নিজের কর্মের রেকর্ড ও চলমান ছবি দেখতে পায়, এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যখনই কোন মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, তখন তার সাথে দু'জন ফেরেশ্তা নিয়োগ করেন। তাঁরা সেই মানুষের কথা ও কর্মসমূহ রেকর্ড করেন। আল্লাহর প্রতি কোন মানুষ যেন এই অভিযোগ আরোপ না করে যে, তিনি আমার প্রতি জুলুম করেছেন। কারণ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ–এরা নিজেদের অপকর্মের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় আর দোষ চাপিয়ে দেয় আল্লাহর ওপরে। বিপদ দেখলে আল্লাহকে ডাকতে থাকে আর বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেই তাঁকে ভুলে যায়। এ জন্য মানুষ পৃথিবীর জীবনে যা কিছু করছে তার চলমান ছবি রাখা হচ্ছে, রেকর্ড রাখা হচ্ছে এবং কণ্ঠ শব্দও রেকর্ড করা হচ্ছে। বিচার দিবসে চলমান ছবিতে যে যখন দেখতে পাবে, কোথায় কোন

অবস্থায় নির্জনে একাকী সে কি ঘটিয়ে ছিল, কবে কোনদিন কাকে কি কথা বলেছিল-তখন তার পক্ষে কোন কিছুই অস্বীকার করা সম্ভব হবে না। সেদিন কি অবস্থার সৃষ্টি হবে মহান আল্লাহ সূরা কাহ্ফ-এ তা শোনাচ্ছেন-

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا هُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا-وَعُرِضُوْا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا-لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَاخَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا-وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّافِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَامَالِهٰذَا الْكِتَابُ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً اِلَّاَ اَحْصَاهَا-وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا-وَّلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا-

সেদিনের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন যেদিন আমি পাহাড়গুলোকে চালিত করবো এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে সম্পূর্ণ অনাবৃত আর আমি সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এমনভাবে ঘিরে এনে একত্র করবো যে, (পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্য থেকে) একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। এবং সবাইকে তোমার রব-এর সামনে কাতারবন্দী করে পেশ করা হবে। (তখন বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাসীদেরকে বলা হবে) নাও দেখে নাও, তোমরা এসে গেছো তো আমার সামনে ঠিক তেমনিভাবে যেমনটি আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম! তোমরা তো মনে করেছিলে আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত ক্ষণ নির্ধারিতই করিনি। আর সেদিন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। সে সময় তোমরা দেখবে অপরাধীরা নিজেদের জীবন খাতায় যা লেখা আছে সে জন্য ভীত হচ্ছে এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা, আমাদের ছোট বড় এমন কোন কিছুই এখানে লেখা থেকে বাদ পড়েনি। তাদের যে যা কিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারো প্রতি জুলুম করবেন না। (সূরা কাহ্ফ-৪৭-৪৯)

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে নিয়ে কিয়ামতের পূর্বে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত যেসব মানুষ পৃথিবীতে আগমন করবে, তারা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাসে মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস গ্রহণ করলেও তাদের প্রত্যেককে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে এবং সবাইকে একই সাথে একত্রিত করা হবে। কোথাও কেউ বাদ

পড়বে না। পৃথিবীতে পঞ্চাশ বা একশজন মানুষকে একত্রে আসামী করে মামলা দায়ের করা হলে কোর্টে যখন তারা হাজিরা দেয়, তখন অনেক আসামীই উপস্থিত না থেকে অন্য কাউকে আদালতে পাঠিয়ে দেয়। মূল আসামীর পক্ষে আরেকজন হাজিরা দিয়ে আসে। বিচারক প্রত্যেক আসামীর চেহারা চিনে রাখতে পারে না। এ জন্য আসামী এ ধরনের কৌশল করে থাকে। আসামীর নাম ধরে ডাকার সময় মূল আসামীর পরিবর্তে অন্য লোক তার উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। মাত্র দশজন বিশজন পঞ্চাশ জন আসামীর হাজিরার ক্ষেত্রে পৃথিবীর মানুষ বিচারককে এভাবে ধোকা দেয়া যায়, কিন্তু বিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে এভাবে ধোকা দেয়া যাবে না। সেদিন কত শতকোটি মানুষ যে আল্লাহর আদালতে একত্রে দাঁড়াবে, তা কল্পনাও করা যায় না। কোন একজন মানুষও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হবে না।

সবাইকে আপন রব আল্লাহ তা'য়ালার সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াতে হবে। পৃথিবীতে যারা বিচার দিবসের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে সেদিন সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো, মৃত্যুর পরে পুনরায় সৃষ্টি করা অসম্ভব বলে ধারণা করতো, তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যে বিষয়টির প্রতি অবিশ্বাস করতে, এখন তো দেখলে কিভাবে তা বাস্তবায়িত হলো ! যে বিচার দিবস সম্পর্কে তোমরা তামাশা করতে, তোমাদের সেই তামাশাই আজ রূঢ় বাস্তবে পরিণত হয়েছে সেটা নিজের চোখে দেখে নাও।'

সেদিন আমলনামা প্রদর্শন করা হবে

এরপর ঐসব অবিশ্বাসীদের সামনে সেই কিতাব রাখা হবে, যে কিতাবে তাদের পৃথিবীর জীবনের যাবতীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোথায় কোনদিন চার দেয়ালের মধ্যে নিভৃত কক্ষে নিজ দলীয় বা বিরোধী দলীয় প্রতিপক্ষকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল, কোনদিন কোন মুহূর্তে কোন নারীকে ধর্ষন করেছিল, কি অবস্থায় কোন ব্রান্ডের মদ পান করেছিল, কোন ফাইলে কলমের এক খোঁচা দিয়ে জাতিয় অর্থ আত্মসাৎ করেছিল, নির্দোষ প্রতিপক্ষকে আসামী বানানোর জন্য কোথায় কিভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছিল, কোন টেবিলে বসে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট তৈরী করে পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, এ ধরনের অসংখ্য অপরাধের কোনকিছুই বাদ পড়েনি।

অসংখ্য ক্রাইম রিপোর্ট সম্বলিত নিজের জীবনলিপি দেখে অপরাধীরা আযাব থেকে বাঁচার জন্য সমস্ত কিছু অস্বীকার করে বলবে, এসব কাজ আমরা একটিও করিনি।

অপরাধীরা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলবে। তারা তাদের অপরাধ মেনে নিতে অস্বীকার করবে। সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলবে এবং ক্রাইম রিপোর্ট সম্বলিত নিজের জীবনলিপির নির্ভুলতাও মেনে নেবে না। ফেরেশ্তাদেরকে দোষারোপ করে বলবে, তারা মনগড়া রিপোর্ট রচিত করেছে, এসবের কোন কিছুই আমাদের দ্বারা ঘটেনি। তারপর সেই চলমান ছবি তাদের সামনে উত্থাপন করা হবে। অপরাধীরা দেখতে থাকবে পৃথিবীতে কোথায় তারা কি করেছিল এবং নিজের কণ্ঠ শুনতে থাকবে, কবে কোনদিন কি বলেছিল। এরপর আল্লাহ আদেশ দেবেন, তোমাদের এসব মিথ্যা কথা বন্ধ করো এবং এখন দেখো তোমাদের নিজেদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমাদের কৃতকর্মের কি বর্ণনা দেয়।

সেদিন যাবতীয় কর্মকান্ড প্রকাশ করে দেয়া হবে

আল্লাহদ্রোহীদের সমস্ত কার্যকলাপ রেকর্ড করা হচ্ছিলো আর এই রেকর্ড সেদিন তাদেরকে প্রদর্শন করা হবে এবং বলা হবে, এখন মজাটা অনুভব করো। আজ আমি তোমাদের জন্য শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করবো না। মহান আল্লাহ কিয়ামতের পরে বিচারের দিন সম্পর্কে বলেন–

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ-وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ-وَمَا أَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ-ثُمَّ مَا أَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ-يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ-

বিচারের দিন তারা সেখানে প্রবেশ করবে এবং সেখান হতে কখনো অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। আর তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি? পুনরায় বলছি, তুমি কি জানো সেই বিচারের দিনটি কি? এটা সেই দিন, যখন কারো জন্যে কিছু করার সাধ্য থাকবে না। সেদিন ফায়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারেই থাকবে। (ইনফিতার– ১৫-১৯)

পবিত্র কোরআনের সূরা তারিকে বলা হয়েছে–

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ-فَمَالَه مِنْ قُوَّةٍ وَّلاَ نَاصِرٍ-

সেদিন গোপন অজানা তত্ত্ব ও রহস্য সমূহের যাচাই পরখ করা হবে। তখন মানুষের কাছে না নিজের কোন শক্তি থাকবে না কোন সাহায্যকারী তার জন্য আসবে। (আত-তারিক– ৯-১০)

গোপন অজানা তত্ত্ব বলতে মানুষের কর্মসমূহকে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের কর্মসমূহ এক গোপন অজানা ব্যাপার। মানুষ প্রকাশ্যে যা করে, তা সবারই দৃষ্টি গোচর হয়। কিন্তু এই মানুষই অন্য মানুষের দৃষ্টির আড়ালে যা করে, সেসব তো কোন মানুষের চোখে পড়ে না। আবার মানুষ প্রাকাশ্যেও এমন অনেক কাজ করে যা দেখে অন্য মানুষ প্রশংসা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ওই প্রশংসামূলক কাজ করলো, ওই কাজের পিছনে যে তার কি উদ্দেশ্য মনোভাব ও নিয়ত গোপন থাকে, যে প্রবণতা, মতলব ও কামনা -বাসনা কাজ করতে থাকে, তার যে গোপন কার্যকারণ নিহিত প্রচ্ছন্ন থাকে, তা অন্য মানুষের নিকট অজানাই রয়ে যায়।

কিন্তু বিচারের দিনে তা সব কিছুই প্রকাশ করে দেয়া হবে। পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি কি কাজ করেছে, কিয়ামতের দিন শুধু সেসব কাজের হিসাব ও বিচারই হবে না বরং কি উদ্দেশ্যে, কি স্বার্থে করেছে, কি ইচ্ছা ও মানসিকতা নিয়ে করেছে তারও অত্যন্ত সুক্ষ্ম বিচার ও যাচাই করা হবে। মানুষ পৃথিবীতে এমন অনেক কাজ করে, যে কাজের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অন্য মানুষের উপর পড়ে, অনেক দূর পর্যন্ত সে কাজের প্রভাব বিস্তার করে, অনেকদিন পর্যন্ত সে প্রভাব বজায় থাকে, তা বহু মানুষের অজানা থাকে এবং স্বয়ং যে ব্যক্তি কাজ করেছে তারও অজানা থেকে যায়। এই অজানা রহস্যও সেদিন সর্বসম্মুখে প্রকাশ করে তা সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে যাচাই করা হবে।

একটা উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা স্পষ্ট করা যাক, ধরা যাক এক লেখক এমন একটি অশ্লীল নগ্ন বই লেখে প্রকাশ করলো, যে বইটি পড়ে বহু মানুষ চরিত্র হারালো, বইটা বহু দেশের লোক পড়লো এবং তাদের মধ্যে অনেকেই চরিত্র হারালো। এখন যে লেখক ওই ধরনের নোংরা বই লিখলো, সে সঠিকভাবে জানতেও পারলো না তার লেখা বই পড়ে কত মানুষ চরিত্র বরবাদ করেছে। কত দূর পর্যন্ত তার ওই নিকৃষ্ট বইয়ের প্রভাব পড়েছে। কত কাল পর্যন্ত ওই জঘন্য বইয়ের কারণে কত মানুষ চরিত্র হারাতে থাকবে। সে কথা লেখকের অজানা রয়ে যায়।

আবার যার যুবক সন্তান ওই নোংরা বই পড়ে চরিত্র হারালো সেই পিতা-মাতাও জানতে পারলো না, কি কারণে তার সন্তান চরিত্র হারালো। কিন্তু বিচারের দিন সমস্ত কিছু প্রকাশ করে দিয়ে তার চুলচেরা বিচার করে উপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে।

আমলনামা দেখে অপরাধীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা কাহ্ফ-এর ৪৯ নং আয়াতে বলেন-

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً اِلاَّ اَحْصٰهَا-وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا-وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا-

আর যখন আমল নামা সম্মুখে রেখে দেয়া হবে, তখন তোমরা দেখবে অপরাধীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আর বলছে, হায়রে আমাদের দুর্ভাগ্য! এটা কেমন বই, আমাদের ছোট বড় এমন কোন কাজ বাদ যায়নি (যা এই বইতে) লেখা হয়নি। তারা যে যা কিছু করেছিল তা সমস্তই নিজের সামনে (লেখা ও ছবিসহ) উপস্থিত দেখতে পাবে। আর তোমার রব কারো প্রতি কোন জুলুম করবেন না।

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ-لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ-اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

আজ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার (পৃথিবীতে জীবিত থাকতে) উপার্জনের প্রতিফল দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। (আল-মু'মিন- ১৭)

আল্লাহর কোরআনে সূরা যুমারের ৬৯ নং আয়াতে এসেছে-

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْئَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ-

(প্রত্যেকের) আমলনামা (কর্মলিপি) সামনে উপস্থিত করা হবে। নবী রাসূল ও সকল সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে। মানুষদের মধ্যে যথাযথভাবে (সত্য সহকারে) ফয়সালা করে দেয়া হবে। কারো উপর কোন জুলুম করা হবে না।

এই আয়াতে সাক্ষী বলতে যারা মানুষের মধ্যে নানাভাবে ইসলামের বিধান প্রচার ও প্রসার করেছে তাদেরকে ও সেসব সাক্ষী ও যারা মানুষের কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে। এ সমস্ত সাক্ষী শুধু মাত্র মানুষই হবে না, ফেরেশ্তা, জ্বিন, অন্যান্য

প্রাণীসমূহ, মানুষের নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তথা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সাক্ষী প্রদান করবে কিয়ামতের দিন। পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের সেবা করার জন্যে– আর মানুষের প্রতি নির্দেশদান করা হয়েছে, আমার নেয়ামত ভোগ করো এবং আমার দাসত্ব করো। কিন্তু কোন কিছুকেই মহান আল্লাহ মানুষের দাস করে সৃষ্টি করেননি। এমনকি মানুষের নিজ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নয়। হাদিস শরীফে এসেছে প্রতিদিন সূর্য উদয়ের পূর্বে মানুষের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের আত্মার কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে অনুরোধ করে বলে– দেখো, আমাকে তুমি ব্যবহার করতে পারো, সে স্বাধীনতা তোমার আছে। কিন্তু অনুরোধ, আমাদেরকে ইসলাম বিরোধী কোন কাজে ব্যবহার করো না। যদি করো, তাহলে কিয়ামতের দিন তোমার বিরুদ্ধে আমরা সাক্ষী দিতে বাধ্য হবো। কারণ আমরা তোমার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হলেও আমরা ওই মহান আল্লাহর দাস।

সেদিন হাত-পা সাক্ষী দেবে

পবিত্র কোরআনের সূরা ইয়াছিনের ৬৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এরা পৃথিবীতে কি উপার্জন করে এসেছে।

শুধু যে হাত ও পা-ই সাক্ষ্য দেবে তাই নয়–যে কণ্ঠ দিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে, তাঁর দেয়া বিধানের বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে কথা বলেছে, শ্লোগান দিয়েছে, সেই কণ্ঠও তারই বিরুদ্ধে আল্লাহর আদেশে বিচারের দিনে সাক্ষ্য দিবে। মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ-

তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায় যেদিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং তাদের নিজেদের হাত-পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। সেদিন তারা যে প্রতিদানের যোগ্য হবে, তা আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসাবে প্রকাশকারী। (সূরা নূর-২৪-২৫)

এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীসে বলা হয়েছে, যেসব অপরাধী আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েও নিজের অপরাধের স্বীকৃতি দিবে না, তখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে একে সাক্ষ্য দেবে যে, ঐগুলোর সাহায্যে কোথায় কি অবস্থায় কোন কাজের আঞ্জাম দেয়া হয়েছে। আখিরাতের জগত কোন আত্মিক জগৎ হবে না। বরং মানুষকে সেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে পুনরায় ঠিক তেমনি জীবিত করা হবে যেমনটি বর্তমানে তারা এই পৃথিবীতে জীবিত রয়েছে। যেসব উপাদান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে এই পৃথিবীতে তাদের দেহ গঠিত, কিয়ামতের দিন সেগুলোই একত্রিত করে দেয়া হবে এবং যে দেহে অবস্থান করে সে পৃথিবীতে কাজ করেছিল পূর্বের সেই দেহ দিয়েই তাকে উঠানো হবে।

সেদিন চোখ, কান ও দেহের চামড়াও সাক্ষী দেবে

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

حَتّٰى اِذَا مَاجَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا-قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

পরে যখন সবাই সেখানে পৌঁছে যাবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া তারা পৃথিবীতে কি করতো সে সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের শরীরের চামড়াসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন ? (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও চামড়া) জবাব দেবে, সেই আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (সূরা হামীম সাজ্‌দাহ্-২০-২১)

পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় যারা বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করেছে, এরা বিচার দিবসেও নিজেদের অপরাধ ঢাকা দেয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলবে। অনিবার্য শাস্তি ও তার ভয়াবহতা দেখে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যখন তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবে, তখন তাদের পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার করার অভিযোগও তোলা মোটেও অসম্ভব নয়। এ জন্য পৃথিবীতে মানুষের জীবনলিপি-কণ্ঠস্বর রেকর্ড ও চলমান ছবি সংরক্ষণের ব্যবস্থাই শুধু করা হয়নি,

পক্ষপাতহীন বিচারের লক্ষ্যে এমন এক ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, মানুষ অপরাধ সংঘটনের সময় তার দেহের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করেছিল, সেসব কিছুই যেন তার কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে। মহান আল্লাহ এমনিতেই মানুষের অসংখ্য অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তারপরেও বান্দা যেন শাস্তিভোগ না করে, এ জন্য তিনি অত্যন্ত সুক্ষ্ম বিচার করবেন। সেদিন কারো প্রতি সামান্যতম জুলুম করা হবে না। যারা পৃথিবীতে সৎকাজ করেছে, তাদের সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর যারা অসৎ কাজ করেছে, সেই অসৎ কাজের পরিমাণ অনুযায়ীই শাস্তি প্রদান করা হবে, এর জন্য কোন বর্ধিত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه عَشْرُ اَمْثَالِهَا-وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزى اِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ-

প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি (আল্লাহর দরবারে) সৎকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য দশগুণ বেশী পুরস্কার রয়েছে। যে পাপের কাজ নিয়ে আসবে তাকে ততটুকুই প্রতিফল দেয়া হবে, যতটুকু সে অপরাধ করেছে। আর কারো ওপরে জুলুম করা হবে না। (সূরা আন'আম-১৬০)

সেদিন সুবিচারের মানদন্ড স্থাপন করা হবে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আম্বিয়া-এর ৪৭ নং আয়াতে বলেন–

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًاوَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا-وَكَفى بِنَا حَاسِبِيْنَ-

কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওজন করার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কোন ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম জুলুম হবে না। যার তিল পরিমাণও কোন কর্ম থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসাব করার জন্য আমি যথেষ্ট।

সেদিন আল্লাহর সুবিচারের মানদন্ডে ওজন ও সত্য উভয়ই সমার্থবোধক হবে। সত্য ব্যতীত সেদিন অন্য কোন জিনিসেই ওজন পরিপূর্ণ হবে না এবং ওজন ছাড়া কোন জিনিসই সত্য বলে বিবেচিত হবে না। যার কাছে যত সত্য থাকবে, সে ততটা ওজনদার হবে এবং সিদ্ধান্ত যা-ই হবে তা ওজন হিসাবে ও ওজনের

দৃষ্টিতেই হবে। অপর কোন জিনিসের বিন্দুমাত্র মূল্য স্বীকার করা হবে না। ইসলাম বিরোধিদের জীবন পৃথিবীতে যত দীর্ঘ হোক না কেন, যত শানশওকতপূর্ণ ও বাহ্যিক কীর্তিপকলাপে পরিপূর্ণ হোক না কেন, আল্লাহর পরিমাপকযন্ত্রে তার কোন ওজনই হবে না। মৃত্যুর পরে তার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে মহাআড়ম্বরে শোক প্রকাশ-প্রচার মাধ্যমে তার কীর্তিগাঁথা প্রচার, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে রাখা, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন, তোপধ্বনীর মাধ্যমে কবরে অবতরণ,এসবের কোন মূল্যই আল্লাহ দিবেন না।

যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কুলি-মজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছে, বাঘের বা সাপের কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তারপর তার লাশ বাঘের পেটে হজম হয়ে গিয়েছে, সে যদি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে থাকে, আল্লাহর কাছে তার ওজন হবে অপরিসীম এবং তার মর্যাদা হবে বিরাট। পৃথিবীতে জাঁকজমকের সাথে চলাফেরা করেছে অথচ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি, বিচার দিবসে সে ওজনদার হবে না। সেদিন শুধু তারাই ওজনদার হবে, পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِايٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ-

আর ওজন ও পরিমাপ সেদিন নিশ্চিতই সত্য-সঠিক হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজেদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে। কারণ তারা আমার আয়াতের সাথে জালিমের ন্যায় আচরণ করছিল। (সূরা আল আ'রাফ-৯)

আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও অন্তরে নেই, নামাজ-রোজা আদায় করার কোন প্রয়োজন অনুভব করে না। কেউ কেউ হজ্জ আদায় করে এ জন্য যে, নির্বাচন এলে নামের পূর্বে 'আল হাজ্জ' শব্দটি ব্যবহার করে ধর্মভীরু মানুষদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য। এদের মধ্যে অনেকে বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে। অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে এরা দেশের বিশিষ্ট নাগরিকে পরিণত হয়েছে। সাধারণ লোকজন এদেরকে মূল্য দিয়ে থাকে, সম্মান-মর্যাদা দেয়। মহান আল্লাহর আদালতে বিচার দিবসে এদের কোনই মূল্য নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً-اَلَّذِيْنَ ضَلَّ

سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِايٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ اَعْمَا لُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا-

হে রাসূল ! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ কারা ? সে লোকগুলো তারা, যারা পৃথিবীর জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সব সময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সব কিছু সঠিক করে যাচ্ছে। এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রব-এর নিদর্শনাবলী মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হবার ব্যাপারটি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোন গুরুত্ব দেয়া হবে না। (কাহ্ফ-১০৩-১০৫)

অর্থাৎ যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সাধনা পৃথিবীর জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। তারা যা কিছুই করেছে আল্লাহর প্রতি সম্পর্কহীন হয়ে ও আখিরাতের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীতে অর্থ-বিত্ত, ঐশ্বর্য, সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্যই করেছে। পৃথিবীর জীবনকেই তারা একমাত্র জীবন মনে করেছে। পৃথিবীর জীবনে সফলতাকেই তারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছিল। এরা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও তাঁর সন্তুষ্টি কোন কর্মের মধ্যে নিহিত এবং তাঁর সামনে বিচার দিবসে দাঁড়াতে হবে, সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে, এ কথা তারা মনে স্থান দেয়নি। তারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সম্মান ও মর্যাদা লাভের যোগ্য একজন মনে করতো। এরা পৃথিবীর চারণ ভূমি থেকে একমাত্র নিজেদের স্বার্থোদ্ধার ব্যতীত অন্য কোন কাজ করতো না।

বিচার দিবসের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাবলীর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি কোন জুলুমের বোঝা বহন করে নিয়ে যাবে, সে আল্লাহর অধিকারের বিরুদ্ধে জুলুম করুক বা আল্লাহর বান্দাদের অধিকারের বিরুদ্ধে অথবা নিজের নফ্সের বিরুদ্ধে জুলুম করুক না কেন, যে কোন অবস্থায়ই সেসব কর্ম তাকে নিকৃষ্ট পরিণতি থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। বিচার দিবসের দিনে সমস্ত মানুষ যখন মহান আল্লাহর মহাপ্রতাপ দেখবে, তখন তাদের মাথা আপনা আপনিই ঝুঁকে পড়বে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّوْمِ-وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا-وَمَنْ

يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا-

লোকদের মাথা চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত সত্তার সামনে ঝুঁকে পড়বে, সে সময় যে জুলুমের গোনাহের ভার বহন করবে সে ব্যর্থ হবে। আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে এবং সেই সাথে সে মুমিনও হবে তার প্রতি কোন জুলুম বা অধিকার হরণের আশঙ্কা নেই। (ত্বা-হা-১১১-১১২)

অনেক মানুষ প্রশ্ন তোলে, পৃথিবীতে অমুসলিমগণ যে সৎকর্মসমূহ করে অর্থাৎ তাদের অনেকে অসংখ্য জনকল্যাণমূলক কর্ম করে, দান করে, তাদের দ্বারা অসংখ্য মানুষ উপকৃত হয় এদেরকে বিচার দিবসের দিনে কি ধরনের প্রতিফল দেয়া হবে ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তিনি রাহ্মান ও রাহীম। তিনি কারো সৎকর্ম বৃথা যেতে দেন না। সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী এবং এই পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকার জন্য প্রতি মুহূর্তে তিনি রাহ্মত বর্ষণ করছেন, এগুলো তো শুধুমাত্র ঈমানদারগণই ভোগ করছে না, তারাও এগুলো ভোগ করছে। শুধু তাই নয়, এই পৃথিবীতে তাদের কর্মের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে এমন অসংখ্য দুর্লভ নিয়ামত ভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, যা তিনি ঈমানদারকে দেননি। আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না, স্বীকার করলেও শির্ক করে, তাদের সৎকাজের বিনিময়ে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে বাড়ি, গাড়ি, অঢেল সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা, যশ-খ্যাতি দান করেছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিয়ামতসমূহ ভোগ করার সুযোগ প্রদান করেছেন, তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের কাউকে কাউকে পরম শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করেছেন, এসব তো তারা তাদের সৎকাজের বিনিময় হিসাবে লাভ করেছে। একটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে, যে কোন সৎকাজ কবুলের ও আখিরাতে তার বিনিময় লাভের পূর্ব শর্ত হলো, ঈমানদার হতে হবে। ঈমানহীন কোন সৎকাজের বিনিময় বিচার দিবসে পাওয়া যাবে না–এই পৃথিবীতেই তার বিনিময় দিয়ে দেয়া হবে।

এদের বিপরীতে অধিকাংশ ঈমানদারদের জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, মানুষকে আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান জানাতে গিয়ে এদেরকে অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করতে হয়, জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে আবদ্ধ থাকতে হয়, সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। অর্ধাহারে-অনাহারে জীবন কাটাতে হয়, জীবন-যাপনের তেমন কোন উপকরণ থাকে না, মনের একান্ত বাসনা আল্লাহর ঘরে

গিয়ে আল্লাহকে সেজ্‌দা দিবে, অর্থাভাবে সে অদম্য কামনা বুকে নিয়েই কবরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য উত্তম পোষাক, উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারে না, নিজের মেধাবী পুত্র বা কন্যাকে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা দিতে পারে না। মাথা গোঁজার জন্য এক টুকরো যমীন কিনতে পারে না, রোগাক্রান্ত হলে তেমন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না।

এরপরেও তারা সমস্ত পরিস্থিতি হাসিমুখে মোকাবেলা করে আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করে। নিজেকে অপরাধী মনে করে সেজ্‌দায় পড়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে। পৃথিবীতে ধন-সম্পদ না চেয়ে আল্লাহর দরবারে পরকালের কল্যাণ কামনা করে। আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারকে কিয়ামতের ময়দানে তাদের কর্মের সর্বোত্তম বিনিময় দান করবেন, সেদিন কারো প্রতি সামান্য অবিচার করা হবে না। সবাই যার যার অধিকার বুঝে পাবে।

প্রতিদান ও সুবিচারের বেশ কয়েকটি রূপ হতে পারে। প্রতিদান লাভের অধিকারী ব্যক্তিকে প্রতিদান না দেয়াও অবিচার এবং জুলুম। প্রতিদান লাভকারী যতটা প্রতিদান লাভের উপযুক্ত তার থেকে কম দেয়াও অবিচার ও জুলুম। যে ব্যক্তি শাস্তি লাভের যোগ্য নয়, তাকে শাস্তি দেয়াও অবিচার এবং জুলুম। আবার যে শাস্তি লাভের যোগ্য তাকে শাস্তি না দেয়া এবং যে কম শাস্তি লাভের যোগ্য, তাকে অধিক শাস্তি দেয়াও জুলুম ও অবিচার।

জালিম শাস্তি পাচ্ছে না, নির্দোষ অবস্থায় খালাস পাচ্ছে আর মজলুম তা অসহায়ের মতো নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখছে, এটাও অবিচার ও জুলুম। একজনের অপরাধের কারণে অন্যজন শাস্তি লাভ করছে, একের অপ্রাধ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, এসবই জুলুম আর অবিচারের কারণে হয়ে থাকে। বিচার দিবসে এসবের কোনকিছুই ঘটবে না। মহান আল্লাহ কারো প্রতি কোন ধরনের জুলুম করবেন না। বিচার দিবসের দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে ভাষণে বলা হবে–

فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلاَ تُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ–

আজ কারো প্রতি তিলমাত্র জুলুম করা হবে না এবং যেমন কাজ তোমরা করে এসেছো ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে। (সূরা ইয়াছিন-৫৪)

অপরাধীদেরকে প্রাপ্য শাস্তির অধিক দেয়া হবে না

যারা জান্নাত লাভ করবেন, তাঁরা তাঁদের কর্মের বিনিময় যতটুকু ততটুকুই লাভ করবেন না, বরং করুণাময় আল্লাহ বহুগুণ বেশী দান করবেন। আর যারা জাহান্নামে

গমন করবে, তারা তাদের কর্মের বিনিময় হিসাবে যতটুকু শাস্তি লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, ততটুকুই ভোগ করবে, সামান্য বেশী কম হবে না। আল্লাহর কোরআন বলছে–

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ–وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلاَذِلَّةٌ–اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ–هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ–وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا–وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ–مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ–كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا–اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ–هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ–

যারা ভালো কাজের নীতি অবলম্বন করেছে, তারা ভাল ফল লাভ করবে আর অধিক অনুগ্রহও। কলঙ্ক কালিমা ও লাঞ্ছনা তাদের মুখমন্ডলকে মলিন করবে না। তারাই জান্নাত লাভের অধিকারী; সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। আর যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা তাদের পাপ অনুপাতেই প্রতিফল লাভ করবে। লাঞ্ছনা তাদের ললাট লিখন হয়ে থাকবে। আল্লাহর এই আযাব থেকে তাদের রক্ষাকারী কেউ নেই। তাদের মুখমন্ডলে এমন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে যেমন রাতের কালো পর্দা তাদের ওপরে পড়ে রয়েছে। তারাই জাহান্নামে যাবার যোগ্য, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা ইউনুস-২৬-২৭)

অর্থাৎ ভালো কাজের বিনিময়ে যতটুকু প্রতিফল পাওয়ার যোগ্য হবে, তার থেকে কয়েকগুণ বেশী দেয়া হবে, আর মন্দ কাজের বিনিময়ে অতিরিক্ত কোন শাস্তি দেয়া হবে না। যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুই দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه خَيْرٌ مِّنْهَا–وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ امِنُوْنَ–وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ–هَلْ تُجْزَوْنَ الاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ–

যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে বেশী ভালো প্রতিদান পাবে এবং এ ধরনের লোকেরা সেদিনের ভীতি-বিহ্বলতা থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যারা অসৎকাজ নিয়ে আসবে, তাদের সবাইকে অধোমুখে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা কি যেমন কর্ম তেমন ফল ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান পেতে পারো। (সূরা আন নামল-৮৯-৯০)

একই কথা সূরা আল কাসাসে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا-وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاتِ الاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

যে কেউ ভাল কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে ভাল ফল এবং যে কেউ খারাপ কাজ নিয়ে আসে তার জানা উচিৎ যে, অসৎ কর্মশীলরা যেমন কাজ করতো ঠিক তেমনিই প্রতিদান পাবে। (সূরা কাসাস-৮৪)

হাশরের ময়দানে অপরাধীগণ সময় সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে পড়বে

মানুষের ইতিহাসে আল্লাহর ফায়সালা মানুষেরই সময় নির্ধারক ও পঞ্জিকার হিসাব অনুসারে হয় না। যেমন আজকে একটি ভুল বা সঠিক নীতি অবলম্বন করা হলো এবং কালই তার মন্দ বা ভালো ফলাফল প্রকাশ হয়ে গেলো, বিষয়টি এমন নয়। কোন জাতিকে যদি বলা হয় যে, অমুক কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের কারণে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কথার জবাবে সেই জাতি যদি এই যুক্তি পেশ করে যে, এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার পর আমাদের জীবন কাল থেকে দশ, বিশ বা পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, এখনো তো তোমার কথা অনুসারে আমরা ধ্বংস হয়নি। এ কথা যে জাতি বলবে তারা নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিবে। কেননা, ঐতিহাসিক ফলাফলের জন্য দিন, মাস বা বছর তো সামান্য বিষয়, শতাব্দীকাল তেমন কোন বিষয় নয়। যেমন পবিত্র কোরআনের সূরা মাআ'রিজে বলা হয়েছে, মানুষের কাছে যা পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ, আল্লাহর ফেরেশতাগণ তা মাত্র একদিন অতিক্রম করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর কাছের আর মানুষের কাছের সময়ের পার্থক্য কখনোই সমান নয়।

মানুষের হিসাব অনুসারে মৃত্যুর পরে কত শত কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। তারপরেও অপরাধীরা আদালতে আখিরাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে সময় সম্পর্কে কি বলবে, তা আল্লাহ শোনাচ্ছেন–

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا-يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ الاَّ عَشْرًا-

সেদিন যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং আমি অপরাধীদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করে আনবো যে, তাদের চোখ ভয়ে আতঙ্কে দৃষ্টিহীন হয়ে যাবে। তারা পরস্পর

চুপিচুপি বলাবলি করবে, পৃথিবীতে খুব বেশী হলে তোমরা মাত্র দশটা দিন অতিবাহিত করেছো। (সূরা ত্বা-হা-১০২-১০৩)

সূরা ইয়াছিনসহ অন্যান্য সূরাতেও মৃত্যুর পরে আদালতে আখিরাতে ওঠার সময় সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। সূরা মুমিনূন-এ মহান আল্লাহ্ বলেন-

قَلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ-قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ-

আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর ছিলে? জবাব দেবে, একদিন বা দিনের এক অংশ থেকেছি, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিন।

সময় সম্পর্কে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলতে থাকবে। আল্লাহ্ কোরআনে বলছেন-

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ-مَا لَبِثُوْ غَيْرَ سَاعَةٍ-

আর যেদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন অপরাধীরা শপথ করে করে বলবে, আমরা মৃত অবস্থায় এক ঘন্টার বেশী সময় পড়ে থাকিনি। (সূরা রূম-৫৫)

মানুষ যতদিন এই পৃথিবীতে কাল ও স্থানের সীমার মধ্যে দৈহিকভাবে জীবন-যাপন করছে, শুধুমাত্র ততদিন পর্যন্তই তাদের সময়ের চেতনা ও অনুভূতি থাকতে পারে। মৃত্যুর পরবর্তীতে যখন শুধুমাত্র রূহ্ই অবশিষ্ট থাকবে তখন সময় ও কালের কোন চেতনাই মানুষের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না। আদালতে আখিরাতে মানুষ যখন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে, তখন তাদের মনে হবে এই মাত্র কেউ যেন তাদেরকে গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। তারা যে হাজার হাজার বছর মৃত থাকার পর পুনরায় জীবিত হয়েছে, এই চেতনা আদৌ তাদের থাকবে না।

সেদিন মানুষ আপন কর্মের রেকর্ড দেখতে পাবে

সূরার নাবার শেষের আয়াতে বলা হয়েছে, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে সমস্ত কিছু, যা তার হাত পূর্বেই পাঠিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তার নিজের কর্মসমূহ দেখতে পাবে। পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় কৃতকর্মের ফলাফলকে পবিত্র কোরআনে 'কিতাব' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই আমলনামা বা কিতাব কিয়ামতের দিন কিসের উপরে লিখিত থাকবে এবং কিসের মাধ্যমেই বা দেয়া হবে, তা জানা মানুষের জন্যে অসম্ভব ব্যাপার। আর কোরআন হাদিসেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। মানুষকে জানানো যদি প্রয়োজন হতো। নিশ্চয়ই আল্লাহ

তা'য়ালা জানাতেন। আল্লাহ্ তার বান্দাহদের প্রতিটি কথা, তার প্রতিটি গতিবিধি, তার প্রতি মুহূর্তের কার্যকলাপের ছোট ছোট অংশকে, তার মনোভাব ও ইচ্ছা-আকাংখাকে, মনের গহীনের চিন্তা কল্পনাকে, তার ইশারা-ইঙ্গিতকে কিভাবে সংরক্ষণ করছেন, কিভাবে তার সমস্ত খতিয়ান বান্দার সামনে তুলে ধরবেন–এ ব্যাপারে সমস্ত জ্ঞান আল্লাহরই আয়ত্বে। মানুষ কোরআন-হাদিস অধ্যায়ন করে শুধু এতটুকুই বুঝতে পারে, এগুলোকে কিয়ামতের দিন অবশ্যই একটা আকার আকৃতি দেয় হবে। আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন বলেন–

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً-كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى اِلَى كِتٰبِهَا-اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ-اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

প্রত্যেক দলকেই সেদিন বলা হবে–এসো, তোমাদের আমলনামা বা রেকর্ড নিয়ে যাও। আজ তোমাদেরকে সে সব আমলের বিনিময়ে দেয়া হবে, যা তোমরা করেছো। এটা আমাদের তৈরী করা আমলনামা। তোমাদের ব্যাপারে সঠিক ও যথাযথ সাক্ষ্য দেবে। তোমরা (পৃথিবীতে) যা কিছু করছিলে তা সঠিকভাবে লিখে রাখা হতো। (আল-জাসিয়া– ২৮-২৯)

আল্লাহর কোরআনের সূরা মুজাদালায় বলা হয়েছে–সেদিন আল্লাহ সবাইকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন। তারা (পৃথিবীতে) যা কিছু করে এসেছে তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। তারা (তাদের কর্মসমূহ) ভুলে গিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ যাবতীয় কর্মসমূহ গুনে গুনে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। (আল-মুজাদালা– ৫)

অণু পরিমাণ আমলও মানুষ দেখতে পাবে

পবিত্র কোরআনে সূরা যিলযালে মহান আল্লাহ বলেছেন–

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا-لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ-فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَاه-وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه-

সেদিন প্রতিটি মানুষ (দলবল ছেড়ে) বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে, যেন তাদের আমল তাদেরকে দেখানো যায়। এরপর যে ব্যক্তি অনু পরিমানও নেক আমল করবে তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি অনু পরিমানও পাপ আমল করবে তা-ও দেখতে পাবে। (যিলযাল–৬-৮)

সেদিন নিজের আমল নামা নিজেকেই পড়তে হবে

সেদিন নিজের আমল নামা নিজেকেই পড়তে হবে। মহান আল্লাহ জানিয়ে তাঁর নাজিল করা কিতাব পবিত্র কোরআনে জানিয়ে দিয়েছেন–

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِتَبًا يَّلْقَهُ مَنْشُوْرًا–اِقْرَاْ كِتَبَكَ–كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا–

আর কিয়ামতের দিন আমরা তাদের 'আমলনামা' রেকর্ড প্রকাশ করবো, যাতে সমস্ত কিছু প্রকাশ থাকবে। (বলা হবে) পড়ো, নিজের 'আমলনামা' রেকর্ড। আজ নিজের হিসাব নেয়ার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (বনী-ইসরাঈল– ১৩-১৪)

পৃথিবীতে যারা ইসলামী বিধান অনুযায়ী চলেনি তারা বাম হাতে আমলনামা পাওয়ার সাথে সাথে বলবে, এই মুহূর্তে যদি আমার মৃত্যু হতো, তাহলে আযাব থেকে বেঁচে যেতাম! কিন্তু যারা পৃথিবীতে ইসলামের পথে চলেছে, তারা ডান হাতে আমলনামা পেয়ে অত্যন্ত খুশী হবে–কৃতজ্ঞতা জানাবে মহান আল্লাহর দরবারে। পরিশেষে তারা জান্নাত লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন–

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتبَه بِيَمِيْنِه–فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا–وَّيَنْقَلِبُ اِلى اَهْلِه مَسْرُوْرًا–وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتبَه وَرَاءَ ظَهْرِه–فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا–وَيَصْلى سَعِيْرًا–

এরপর যার 'আমল নামা' ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে এবং সে আনন্দ চিত্তে আপনজনের নিকট ফিরে যাবে। আর 'আমলনামা' যার পিছন দিক হতে দেয়া হবে সে মৃত্যুকে ডাকবে। (অবশেষে) সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। (ইনশিকাক– ৭-১২)

যার কাছে হিসাব চাওয়া হবে সেই বিপদে পড়বে

কোরআন এবং হাদিস অধ্যায়ন করে যতদূর জানা যায়, তাহলো হাশরের ময়দানে যে ব্যক্তির হিসাব হবে, সে ব্যক্তির পক্ষে জান্নাতে যাওয়া অসম্ভব। কারণ আল্লাহ যদি সেদিন একটি মাত্র প্রশ্নই করেন, পৃথিবীতে তুমি কতটুকু পানি পান করেছো? তাহলে তো কোন মানুষই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। অতএব যারা জান্নাতি হবে, তারা হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কোরআন শরীফে "ঈমানদারদের হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে বলতে বুঝানো হয়েছে, ঈমানদারদের হিসাব গ্রহনে কড়া-কড়ি ও কঠোরতা অবলম্বন করা হবে না। তাকে প্রশ্ন করা হবে না, অমুক অমুক কাজ তুমি কেন করেছিলে-আজ তার কৈফিয়ত দাও!

নবী-রাসূল ব্যতীত পৃথিবীতে কোন মানুষই ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। সুতরাং ঈমানদারদের আমল নামাতেও গোনাহ্ থাকবে। কিন্তু সে গোনাহ্ তার সৎ আমলের তুলনায় বেশি হবে না। সে কারণে তার গোনাহ মহান আল্লাহ এমনিতেই মাফ করে দেবেন। আল্লাহ কোরআনে ওয়াদা করেছেন, পৃথিবীতে যারা ইসলামের বিধান মেনে চলবে, তাদের সামান্য পাপ-গোনাহ্ তিনি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেবেন।

মানুষ সাধারণত দু'ভাবে গোনাহ্ করে। ইচ্ছাকৃতভাবে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে। ঈমানদারদের আমলনামায় যে সমস্ত গোনাহ্ থাকবে, সে সমস্ত গোনাহ্ হলো অনিচ্ছাকৃত গোনাহ্, আর পৃথিবীতে ঈমানদারগন যখনই বুঝতো সে গোনাহ্ করে ফেলেছে, তখন ঈমানদারের স্বভাব অনুযায়ী সাথে সাথে সে সেজদায় পড়ে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতো। এ সমস্ত কারণেই ঈমানদার ছাড়া পেয়ে যাবে।

আর যারা ইচ্ছাকৃতভাবে অহংকারের সাথে ইসলামের আইন অমান্য করে উচ্চস্বরে বলে, আমি মদ খাওয়া ছাড়বো না। এই ধরণের ব্যক্তি ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এই ধরনের মানুষদের কাছ হতে হিসাব গ্রহণে যে কড়া-কড়ি অবলম্বন করা হবে তা বুঝাবার জন্যে পবিত্র কোরআনে "ছুউল হিছাব" শব্দ সূরা রা'দের ১৮ নং আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হলো অত্যন্ত খারাপভাবে হিসাব গ্রহণ করা। হিসাব গ্রহণের সময় অত্যন্ত কড়া-কড়ি আরোপ করা। তারা ক্ষমা ও সকল প্রকার সাহায্য সহানুভূতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। ঈমানদারদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-এরা এমন মানুষ যে, তাদের ভালো ও নেক আমলসমূহ আমরা গ্রহণ করবো এবং তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো। (সূরা আল-কাহাফ)

বোখারী শরীফে এসেছে কোরআনের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল বলেন, যার কাছ থেকে হিসাব নেয়া হবে, সে-ই বিপদে পড়বে। হযরত আয়েশা

রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জানতে চাইলেন—ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা কি বলেননি যে, যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার কাছ হতে সহজভাবে হিসাব গ্রহণ করা হবে? আল্লাহর রাসূল বললেন—এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমলনামা পেশ করা সংক্রান্ত (অর্থাৎ আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেয়া হবে বটে কিন্তু সহানুভূতির সাথে) কিন্তু যাকে কোন প্রশ্ন করা হবে, সেই ধরা পড়বে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার নামাজে এই দোয়া করতে শুনেছি—হে আল্লাহ! আমার হিসাব হাল্কাভাবে গ্রহণ করো।

তিনি যখন সালাম ফিরলেন তখন আমি এর তাৎপর্য জানতে চাইলাম। জবাবে আল্লাহর রাসূল বললেন—হাল্কাভাবে হিসেব গ্রহণের অর্থ এই যে, বান্দার আমলনামা দেখা হবে এবং তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। হে আয়েশা, সেদিন যার কাছ থেকে হিসাব চাওয়া হবে সেই ধরা পড়বে।

কিয়ামতের দিন আমলনামা হাতে পেয়ে ঈমানদারগন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবে, সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। আর অবিশ্বাসীগণ আমলনামা বাম হতে পেয়ে আফসোস করে বলবে—এখন যদি আমাদের মৃত্যু হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো!

যার কাছে হিসাব চাওয়া হবে সেই মৃত্যু কামনা করবে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেন—

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَه بِيَمِيْنِه-فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ-اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ-فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ-فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ-قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ-كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ -وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَه بِشِمَالِه-فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ-وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَهْ-يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ-

সেদিন যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে (সন্তুষ্ট হয়ে অন্যদেরকে) বলবে—দেখো, পড়ো আমার আমলনামা! আমি ধারণা করেছিলাম আমার নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করা হবে) ফলে তারা আকাংখিত সুখ সম্ভোগে লিপ্ত হবে। আর যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে— হায় আমার আমলনামা যদি

না-ই দেয়া হতো! আর আমার হিসাব কি, তা যদি আমি না-ই জানতে পারতাম! হায় মৃত্যুই যদি আমার চূড়ান্ত হতো! (অর্থাৎ মৃত্যুই যদি সবশেষ করে দিত, তাহলে আজ এই হিসাব দিতে হতো না) (আল-হাক্কাহ- ১৯-২৭)

সেদিন ভয়ংকর সেতু অতিক্রম করতে হবে

জাহান্নামের ওপর দিয়ে সেতু বা ব্রিজ থাকবে। সে সেতু হাশরের ময়দান হতে জান্নাত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। সেতুটি হবে চুলের চেয়েও সরু এবং তরবারীর চেয়েও ধারালো। প্রতিটি মানুষকে-ই ওই ভয়ংকর সেতু অতিক্রম করতে হবে। সেদিন জান্নাতে পৌছানোর ওটাই হবে একমাত্র পথ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا-كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا-

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার উপর আরোহণ করবে না। এটা তো একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকৃত কথা। তা পুরো করা তোমার রবের দায়িত্ব। (মরিয়ম-৭১)

এই পৃথিবীতে যারা কোরআন-হাদিসের আইন ও বিধান অনুসারে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জীবন পরিচালনা করেছে, তারা ওই ভয়ংকর সেতু বা পুলছিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে পৌছাবে। পুলছিরাতের পথ হবে অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। চুলের চেয়ে চিকন ও তরবারীর চেয়েও ধারালো এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি ভয়াবহ পথ অতিক্রম করতে অবশ্যই আলো প্রয়োজন। ঈমানদারগণ চারপাশে আলো পাবে। তাদের সৎ আমল সমূহ সেদিন আলো হয়ে তাদেরকে ঘিরে রাখবে। আর যতই আলো থাক এবং মানুষ সতর্কতার সাথে পা ফেলুক না কেন-ওই ধরনের অনতিক্রমনীয় পথ কোন মানুষের পক্ষেই অতিক্রম করা অসম্ভব। আল্লাহর রহমত ব্যতীত কেউ তা অতিক্রম করতে পারবে না। ঈমানদারদের উপরে আল্লাহর রহমত থাকবে। ফলে তারা পুলছিরাত পার হয়ে জান্নাতে পৌছতে পারবে।

কিন্তু পাপীগণ কোন ক্রমেই পূলছিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। তারা একে একে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। পুলছিরাতে তারা কোন সাহায্য পাবে না। ঈমানদারগণ যখন পুলছিরাত পার হবে, সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ-

সেদিন যখন তোমরা মুমিন পুরুষ ও স্ত্রী লোকদেরকে দেখবে যে, তাদের নূর তাদের সামনে, তাদের ডান দিকে ছুটতে থাকবে। (হাদীদ-১২)

পথ অন্ধকার দেখে অপরাধী পাপীগণ ঈমানদারদের নিকট হতে সাহায্য চাইবে–আমাদেরকে আলো দিয়ে সাহায্য করো, আলো দিয়ে সাহায্য করো।' তখন আল্লাহ তায়ালা পাপীদেরকে প্রচন্ড ধমক দিয়ে বলবেন, যাও, আজ দূরে সরে যাও। (হাদীদ-১৩)

পৃথিবীর বুকে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন সুন্দর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে কেবল মাত্র একটি পথই সরল-সোজা, সুখ-শান্তির আলোয় আলোকিত পথ আছে–সে পথটি হলো ইসলামের পথ। এই পথে যারা না চলে অন্ধের মতো অন্ধকার পথে চলছে–হাশরের ময়দানেও তারা অন্ধের মতোই মুক্তির পথ হাতড়াবে। অবশেষে জাহান্নামে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

যে ব্যক্তি যত বেশী ইসলামের পথে চলবে সে ব্যক্তি পুলছিরাত পার হবার সময় তত বেশী আলো পাবে। সে কারণে সৎ আমলের কম বেশী হবার দরুণ কারো আলো কয়েক মাইল ব্যাপী হবে, আবার কারো আলো কয়েক গজ ব্যাপী হবে আবার কারো আলো শুধু পায়ের পাতা পর্যন্ত থাকবে পুলছিরাত পার হবার গতিও সবার এক রকম হবে না। আল্লাহর বিধান পালনে কম-বেশী হবার দরুণ সেদিন এক একজন মানুষ এক একরকম গতি পাবে। কেউ নিমিষে পার হবে আবার কেউ পার হবে অত্যন্ত ধীরে ধীরে। গতি কম-বেশী হবার একমাত্র কারণ হলো সৎ আমলের কম বেশী করা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেদিন কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ বা ঘোড়ার গতিতে, কেউ আরোহীর গতিতে, কেউ দৌড়িয়ে, আবার কেউ হাঁটার গতিতে (পুলছিরাত) অতিক্রম করবে। (তিরমিজি)

অপর একটি হাদীসে আছে আল্লাহর নবী বলেন, জাহান্নামের উপর একটি রাস্তা হবে। সমস্ত নবী ও রাসূলগণের পূর্বে আমি উম্মতসহ তা অতিক্রম করবো। এ সময় নবীগণ 'হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখো' বলতে থাকবেন কিন্তু আর কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

জাহান্নাম একটি ঘাঁটি বিশেষ

সূরা নাবায় বলা হয়েছে, জাহান্নাম একটি ঘাঁটি বিশেষ এবং এই স্থানটি তাদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, যারা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে আল্লাহদ্রোহী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখানে তারা পানের উপযোগী কোন পানীয় লাভ করবে না, যা কিছু পান করবে তাহলো উত্তপ্ত পানি এবং ক্ষতের ক্ষরণ। এটা তাদের কর্মফল। বিচার দিবসের প্রতি তাদের কোন বিশ্বাস ছিল না এবং তারা আল্লাহর নিদর্শনকে মিথ্যা মনে করতো।

শিকার ধরার জন্য নির্মিত কোন বিশেষ স্থানকেই ঘাঁটি বলা হয়। আরবী 'রাছাদ' শব্দ থেকে 'মিরছাদ' শব্দ এসেছে এবং এর অর্থ হলো ঘাঁটি। প্রশ্ন হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাহান্নামকে ঘাঁটি কেন বলেছেন?

জাহান্নামকে এ জন্যই ঘাঁটি বলা হয়েছে যে, তা শিকার ধরার জন্য ওঁৎ পেতে রয়েছে এবং জাহান্নামের শিকার হবে তারাই যারা এই পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান নিজেরাও অনুসরণ করেনি এবং অন্যকেও অনুসরণ করতে বাধার সৃষ্টি করেছে। পরিবার, সমাজ ও দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যার ফলে সাধারণ মানুষ ইচ্ছে থাকার পরও আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে পারেনি। বিপুল সংখ্যক অনুসারী লাভ করেছে কিন্তু অনুসারীদেরকে কখনো আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত করেনি। পরিবার, সমাজ ও দেশের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়েও অধীনস্থদেরকে কখনো আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান করেনি। যারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করেছে, তাদেরকে মিথ্যা অজুহাতে কারারুদ্ধ করেছে। তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে। জাতির সামনে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে নানা ধরনের কূটজাল বিস্তার করেছে।

পরকালে অবিশ্বাসী এসব দাম্ভিক লোকজন আল্লাহ বিরোধী কর্মকান্ডের মাধ্যমে ক্রমশঃ জাহান্নাম নামক সেই ঘাঁটির দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে। আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেককারী কর্মকান্ড এরা করতে থাকে আর এসব কর্মের কারণে শয়তান প্রকৃতির এক শ্রেণীর লোকজন এদের প্রশংসা করে। এসব অর্বাচীনরা আরো প্রশংসা এবং অর্থের লালসায় আল্লাহ বিরোধী কর্মকান্ডে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়তে থাকে। তাদের মনের গহীনে কখনো এ চিন্তার উদ্রেক হয় না যে, এসব কর্ম আল্লাহর

ক্রোধ সৃষ্টি করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে–বর্তমান পৃথিবীতে যারা চলচ্চিত্রে নগ্ন ভূমিকায় অভিনয় করছে তাদের নোংরামি দেখে শয়তান প্রকৃতির লোকজন ভূয়সী প্রশংসা করে থাকে এবং তারা এ ক্ষেত্রে প্রভূত অর্থও লাভ করে থাকে। এই অর্থ আর প্রশংসা এসব অভিনেতা আর অভিনেত্রীদেরকে নগ্নতার শেষ স্তরে পৌঁছে দেয় অর্থাৎ জাহান্নামের নিকটতর করে দেয়।

এরা অনুভবও করতে পারে না, তারা জাহান্নামের কতটা কাছে এসে পৌঁছেছে। এভাবে আল্লাহদ্রোহী লোকজন একটু একটু করে নিজ কর্মের মাধ্যমে সেই ভয়ঙ্কর ঘাঁটি–জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তারপর পৃথিবীর জীবনকাল শেষ হবার পরে তাদের আবাসস্থল হয় জাহান্নাম এবং তারা হঠাৎ করেই সেই ঘাঁটিতে ধরা পড়ে যায়, যে ঘাঁটি সম্পর্কে পৃথিবীর জীবনে তারা উদাসীন ছিল। এখানে তারা কতদিন অবস্থান করবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে 'ফিহা আহ্কাবা' অর্থাৎ জাহান্নামের ভেতরে একটার পরে আরেকটা যুগ শেষ হতে থাকবে এবং সেটা এমন যুগ, যা কখনো শেষ হবে না।

জাহান্নাম থেকে কেউ বের হতে পারবে না

আল্লাহর কোরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ-يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا-وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ-

ভালো করে জেনে রাখো, যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, গোটা পৃথিবীর ধন-সম্পদও যদি তাদের করায়ত্ত হয় এবং তার সাথে সম পরিমাণ সম্পদ আরো একত্র করে দেয়া হয় আর তারা যদি তা ফিদিয়া হিসাবে দিয়ে কিয়ামত দিনের আযাব থেকে রক্ষা পেতে চায়, তবুও তা তাদের কাছ থেকে কবুল করা হবে না, তারা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করতে বাধ্য। তারা জাহান্নামের অগ্নি-গহ্বর থেকে বের হতে চাইবে কিন্তু তা থেকে তারা বের হতে পারবে না। তাদের জন্য স্থায়ী আযাব নির্দিষ্ট করা হবে। (সূরা মায়িদা-৩৬-৩৭)

আল্লাহদ্রোহী হিসাবে যারা পরিচিতি লাভ করেছে, তারা কখনোই জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে না। জান্নাতীরা জান্নাতে যেমন চিরকাল অবস্থান করবে,

আল্লাহবিদ্রোহীরা তেমনি জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। জাহান্নামে একটি যুগ অতিবাহিত হতে না হতেই আরেকটি নতুন যুগের সূচনা হবে। এভাবে একের পর এক চলতেই থাকবে। আল্লাহর কোরআনে এই বিষয়টিকে বুঝানোর জন্য কোথাও আহ্কাব শব্দ, কোথাও খুলুদ শব্দ আবার কোথাও আবাদা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ হলো চিরকাল। জাহান্নাম নামক সেই ভয়ংকর স্থানটা হচ্ছে বিচিত্র রকমের অসহনীয় যন্ত্রণার বিশাল বিভিষীকাময় অগ্নিদীপ্ত কারাগার। এর মধ্যেকার আযাবের কারণে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি মানবদেহের মধ্যে অবস্থিত হৃদপিন্ড, নাড়ীভূড়ি, শিরা-উপশিরা, অস্থিমজ্জা ইত্যাদীর বিকৃতি ঘটবে। সেখান হতে মুক্তি পাবার বা পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই। ওই জাহান্নামে আযাবের কারণে কোনদিন মৃত্যু হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ-لاَتُبْقِىْ وَلاَتَذَرُ-لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ-

আর তুমি কি জানো, জাহান্নাম কি? তা শান্তিতেও থাকতে দেয়না আবার ছেড়েও দেয় না। চামড়া ঝলসিয়ে দেয়। (সূরা মুদ্দাচ্ছির–২৭)

জাহান্নামে কারো মৃত্যু হবে না

পৃথিবীতে মানুষ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। জাহান্নামেও আল্লাহর বিধান অমান্যকারীগণ বর্ণনাতীত কষ্ট পাবে। কিন্তু সেখানে তাদের কারো মৃত্যু হবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

ثُمَّ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيى

জাহান্নামে মৃত্যু বলে কিছু থাকবে না। কোরআন বলছে, (জাহান্নামে) সে মরবেও না আবার জীবিতও থাকবে না। (আ'লা–১৩)

সেদিন জাহান্নাম প্রচন্ড ক্রোধে যেন ফেটে পড়তে চাইবে। মহান আল্লাহ বলেন–

اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ-تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ-

তারা (অপরাধীগণ) যখন সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন (জাহান্নামের) ক্ষিপ্রতার তর্জন-গর্জন শুনতে পাবে। এবং (জাহান্নামের আগুন) উথাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ আক্রোশে এমন অবস্থা ধারণ করবে যে মনে হবে প্রচন্ড ক্রোধে তা ফেটে পড়বে। (সূরায়ে মুলক–৭-৮)

জাহান্নাম প্রচন্ড আক্রোশে গর্জন করতে থাকবে

হাশরের ময়দানে অপরাধীদেরকে দেখে জাহান্নাম প্রচন্ড আক্রোশে গর্জন করতে থাকবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا-وَاِذَا اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا-

জাহান্নাম যখন দূর হতে তাদেরকে (অপরাধীদেরকে) দেখতে পাবে তখন তারা (পাপীগণ) তার (জাহান্নামের) ক্রোধ ও তেজস্বী গর্জন শুনতে পাবে। আর যখন তাদেরকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে কেবল মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। (ফুরকান- ১২-১৩)

জাহান্নাম অপরাধীদের যন্ত্রণাময় বাসস্থান

জাহান্নাম অপরাধীদের যন্ত্রণাময় বাসস্থান। কিন্তু এরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কোরআন বলছে-

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ-لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ

জাহান্নামের সাতটি দরোজা (স্তর) আছে। প্রত্যেকটি দরোজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল নির্ধারিত আছে। (সূরায়ে হিজর-৪৪)

অকল্পনীয় যন্ত্রণাদায়ক একটি বিশাল এলাকা নিয়ে জাহান্নাম গঠিত। যেখানে অপরাধের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শাস্তির জন্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা এলাকা নির্ধারিত আছে। এ সমস্ত এলাকা সাত ভাগে বিভক্ত। যথা-(এক) হাবিয়া (দুই) জাহীম (তিন) সাকার (চার) লাযা (পাঁচ) সাঈর (ছয়) হুতামাহ্ (সাত) জাহান্নাম।

পৃথিবীতে পাপীদের শ্রেনী বিভাগ রয়েছে। সবার পাপ এক ধরনের নয়। চুরির দায়ে কেউ খুনের আসামীর প্রাপ্য শাস্তি পেতে পারে না। মিথ্যা কথা বলার দায়ে কেউ মদ পানকারীর প্রাপ্য শাস্তি পেতে পারে না। সেহেতু জাহান্নামের সাতটি স্তরে পাপীদের পাপের ধরণ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

এই সাতটি স্তরের মধ্যে আবার প্রত্যেকটি স্তরেও অনেকগুলো বিভাগ আছে। যেমন-গাছ্ছাকঃ এই গাছ্ছাক হলো একটি বিশাল আকৃতির পুকুর বা হ্রদ। এখানে জাহান্নামীদের রক্ত, ঘাম ও পুঁজ জমা হবার স্থান। এসব কিছু প্রবাহিত হয়ে গাছ্ছাকে জমা হবে। গিছলিনঃ এই গিছলিন হচ্ছে জাহান্নামীদের মল-মূত্র জমা হওয়ার স্থান।

জাহান্নামীগণ যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় চিৎকার করে খাদ্য-পানিয় চাইবে তখন গাছ্‌ছাক ও গিছলিন থেকে ওই সমস্ত মল-মূত্র, রক্ত, পূঁজ, ক্ষরণ ইত্যাদী এনে তাদেরকে খেতে দেয়া হবে। এসব খেয়ে আযাব বৃদ্ধিই পাবে। তীনাতুল খবলঃ এই তীনাতুল খবলও এমন একটি স্থান যেখানে তীনাতুল খবল নামক বিষাক্ত পদার্থ ও পূঁজে পরিপূর্ণ একটি কুপ বিশেষ। সাউদঃ সাউদ হলো তীনাতুল খবলের কিনারে অবস্থিত একটি বিশাল আকৃতির পাহাড়। এক শ্রেণীর অপরাধীদেরকে উক্ত পাহাড়ে উঠিয়ে সাজোরে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়া হবে। অপরাধীদের দেহ থেতলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আবার তাকে পূর্বের ন্যায় গঠন করে পাহাড়ে উঠিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলা হবে। অনন্তকাল ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

যব্বুল হজনঃ এই যব্বুল হজনে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, যারা অহংকার প্রকাশ করতো এবং মানুষের সামনে রিয়া প্রকাশ করতো। রিয়া অর্থ হলো প্রদর্শন করা। যেমন, 'দেখো, আমি একজন নামাজী, আমি রোজাদার।' যামহারীরঃ এই যামহারীর হলো প্রচন্ড শীতের স্থান। যেখানে তাপমাত্রা হলো শুন্য ডিগ্রীর চেয়েও কয়েক শত ডিগ্রীর নিচে। পৃথিবীতে সবচেয়ে ঠান্ডার স্থান হলো এন্টারটিকা। যেখানে শুধু বরফ আর বরফ। নিশ্বাস ফেললেও তা বরফ হয়ে যায়। কিন্তু সে ঠান্ডার মধ্যেও প্রাণী বাস করে। এন্টারটিকায় যে প্রাণীগুলো দেখতে পাওয়া যায়, সে সমস্ত প্রাণীকে মহান আল্লাহ ঠান্ডায় বাস করার মতো উপকরণ এবং দৈহিক শক্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। ভাল্লুক, শিয়াল, হাঁস, মুরগী, কুকুর, ইঁদুর, শীলসহ অনেক প্রাণীকে দেখা যায় তারা এন্টারটিকায় বরফের মধ্যে বাস করছে। মানুষও সেখানে বেঁচে থাকার উপরকণ নিয়ে যায়।

কিন্তু হাশরের ময়দানে জাহান্নামের যামহারীর বিভাগে যে কি পরিমাণ ঠান্ডা বিরাজ করছে তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। গাইঃ এই গাই হলো গোটা জাহান্নামের মধ্যে সব চেয়ে ভয়ংকর স্থান। এই গাই প্রতি মুহূর্তে ভীতিজনক হুংকার ছাড়ছে। গাইয়ের হুংকার শুনে জাহান্নামের অন্যান্য এলাকা প্রতিদিন চারশত বার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলছে, হে আল্লাহ! গাই হতে আমাদেরকে রক্ষা করো!

অস্বীকারকারীদের জন্যই জাহান্নাম

যে কোন পাপীর জন্যই জাহান্নামের শাস্তি নয়- মূলত পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধানের সাথে বিরোধিতা করেছে, ইসলামী আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ

করেছে, তাদের জন্যই জাহান্নাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ-مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ-

প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো, যে সত্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, সৎপথের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, সীমালংঘনকারী এবং দ্বীনের প্রতি সন্দেহ পোষণকারী।" (সূরায়ে কাফ–২৪-২৫)

যে সমস্ত কারণে এক শ্রেণীর মানুষকে জাহান্নামে পাঠিয়ে কঠোর আযাব দেয়া হবে, কোরআন ও হাদিস মনোযোগ দিয়ে অধ্যায়ন করলে তার প্রধান প্রধান কারণ জানা যায়। অর্থাৎ জাহান্নামীদের প্রধান প্রধান অপরাধ সম্পর্কে জানা যায়। যেমন–(এক) আল্লাহ যে সমস্ত নবী ও রাসূলকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছিলেন, সেই জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহন করতে অস্বীকার করা, তাদের সাথে শত্রুতা করা। (দুই) নবী ও রাসূলদের অবর্তমানে যারা অন্যদেরকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে ডাকে, তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণও শত্রুতা করা। (তিন) প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর অনুগ্রহে জীবিত থেকে তাঁর দেয়া নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর শুকরিয়া আদায় না করে অকৃতজ্ঞ হওয়া। (চার) ইসলামী জীবন ব্যবস্থা নিজে গ্রহণ না করে অপরকে গ্রহণ করতে না দেয়া, অপরকে পথভ্রষ্ট করা, ইসলামী আইন যাতে চালু হতে না পারে সেই চেষ্টা করা। (পাঁচ) আল্লাহ যে ধন সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহর পথে খরচ না করা ও মানুষের হক আদায় না করা।

(ছয়) জীবনে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালংঘন করা অর্থাৎ আল্লাহর আই মেনে না চলা। (সাত) অন্যের প্রতি অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার করা। (আট) ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি সন্দেহ পোষণ করা। (নয়) অন্যের মনে ইসলামের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করা। (দশ) আল্লাহর সাথে শরীক করা। (এগার) যা দেয়ার ক্ষমতা শুধু মাত্র আল্লাহর, তা আল্লাহর কাছে না চেয়ে অন্যের কাছে চাওয়া। (বার) ইসলামের নামে ভন্ডামী করা। (তের) অন্যায় কাজে সাহায্য করা। (চৌদ্দ) আল্লাহকে বেশী ভয় না করে মানুষকে বেশী ভয় করা। (পনের) সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্বেও সমাজে দেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না করা। (ষোল) নিজের সুবিধা অনুযায়ী ইসলামের কিছু আইন মেনে চলা ও কিছু আইন না মানা।

জাহান্নামের দ্বাররক্ষী প্রশ্ন করবে

সেদিন অপরাধীদেরকে যখন জাহান্নামের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নামের দ্বার রক্ষী প্রশ্ন করবে। সূরা যুমার-এ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا-حَتَّى اِذَا جَاءُوْ هَافُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ ايتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذَا-قَالُوْا بَلى وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكفِرِيْنَ-قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خلِدِيْنَ فِيْهَا-

অবিশ্বাসী কাফেরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নামের রক্ষক দ্বার খুলে দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে–তোমাদের নিকট কি আল্লাহর রসূলগণ তাঁদের প্রভূর আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনাননি? তোমরা যে এদিনের সম্মুখীন হবে সে সম্পর্কে তারা কি তোমাদেরকে সর্তক করে দেননি? অপরাধীগণ উত্তরে বলবে–হ্যাঁ, তাঁরা সবই তো করেছেন। কিন্তু কাফেরদের জন্যে শাস্তির যে ওয়াদা করা হয়েছিল, সেদিন তা পূর্ণ করা হবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো। অহংকারী কাফেরদের জন্য ভয়ানক গর্হিত স্থান এ জাহান্নাম। আর এখানেই তাদেরকে থাকতে হবে চিরকাল।

অমান্যকারীদের জন্যই জাহান্নাম

মহাগ্রন্থ আল-কোরআন ঘোষণা করছে–

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ-وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ-

যে সব লোক তাদের অস্বীকার ও অমান্য করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। তা মুলতঃ অত্যন্ত ভয়ংকর আবাসস্থল। (মুলক–৬)

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ-خلِدِيْنَ فِيْهَا-لَايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ-

যারা কুফুরী করেছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে, তাদের উপরে আল্লাহর অভিশাপ, ফেরেশ্‌তাদের ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। এ অবস্থায় তারা (জাহান্নামে) অনন্তকাল অবস্থান করবে। তাদের শাস্তি কমানোও হবে না অথবা অন্য কোন অবকাশও দেয়া হবে না। (বাকারা- ১৬১-১৬২)

আল্লাহর নাজিল করা কিতাব পবিত্র কোরআনের সূরা দাহ্‌রে বলা হয়েছে-

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلاً وَّاَغْلٰلاً وَّسَعِيْرًا-

আমরা কাফেরদের জন্যে শিকল, কণ্ঠ কড়া, ও দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। (দাহর-৪)

সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে ধারণা প্রচলিত আছে, যারা ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অনুসরণ করে তারাই কাফের। অবশ্যই মানুষের এ ধারণা সত্য। কিন্তু এর পরেও কথা রয়ে যায়। কাফের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে হলে মুসলিম সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। মুসলিম আরবী শব্দ। যার অর্থ আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ যে বা যারা স্বইচ্ছায় আল্লাহর আইন-কানুন যা তাঁর নবীর মাধ্যমে মানুষের কাছে এসেছে, তাঁর প্রতি অন্তরের বিশ্বাস পোষণ ও মান্য করে এক কথায় তারাই মুসলিম। মুসলিম পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই কেউ মুসলিম হতে পারে না। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে যদি কেউ ইসলামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, তারা অবশ্যই কাফের।

কুফুর শব্দের অর্থ গোপন করা, লুকানো। যেমন ঈমান অর্থ মেনে নেয়া, কবুল করা, স্বীকার করা, এর বিপরীতে কুফুর শব্দের অর্থ না মানা, প্রত্যাখ্যান করা, অস্বীকার করা। কোরআন ও হাদিসের বর্ণনার প্রেক্ষিতে কুফুরীর মনোভাব ও আচার আচরণ বিভিন্ন প্রকার। (১) আল্লাহকে বা তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করা। অথবা তাঁর সার্বভৌমত্ব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার না করা এবং তাকে নিজের ও সমগ্র বিশ্ব জাহানের মালিক, প্রভু, উপাস্য ও মাবুদ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। অথবা তাকে একমাত্র মালিক বলে না মানা। (২) আল্লাহকে মেনে নিয়েও মানুষ কাফের হয়। এই ধরনের কাফেরের সংখ্যা বর্তমান মুসলমান নামে পরিচিত বা দাবীদারদের মধ্যে বেশী। অর্থাৎ মুখে আল্লাহকে স্বীকৃতি দেয় বটে কিন্তু তাঁর বিধান ও হেদায়েত সমূহকে জ্ঞান ও আইনের একমাত্র উৎস হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। (৩) নীতিগতভাবে একথা মেনে নেয়া যে, তাকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে হবে

কিন্তু আল্লাহ তাঁর বিধান ও বানীসমূহ যেসব নবী রাসুলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তাদেরকে অস্বীকার করা। (৪) নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং নিজেদের পছন্দ ও মানসিক প্রবণতা বা গোত্রীয় ও দলীয় প্রীতির কারণে তাদের মধ্যে হতে কাউকে মেনে নেয়া এবং কাউকে না মানা। (৫) নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকীদাহ্ বিশ্বাস নৈতিক-চরিত্র ও জীবন-যাপনের বিধান সম্বলিত যে সব শিক্ষা মানুষের কাছে পেশ করেছেন, এসব শিক্ষার কিছু অংশ গ্রহণ ও কিছু অংশ বর্জন করা। (৬) আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার পরও জেনে বুঝে পার্থিব কোন স্বার্থের কারণে আল্লাহর বিধানের সাথে নাফরমানি করা। নিজে খুবই ধর্মভীরু" এমনভাব দেখিয়ে মানুষকে ধোকা দেয়া।

উল্লেখিত সমস্ত চিন্তা, বিশ্বাস ও কাজ আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার শামিল। উল্লেখিত চিন্তা, বিশ্বাস ও কাজকে কোরআনে কুফুরি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও কোরআনের কোন কোন আয়াতে 'কুফর' শব্দটি আল্লাহর দান, অনুগ্রহ, নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে অমুসলিমগণ সরাসরি বা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে তেমন একটা কিছু করে না কিন্তু তারাই সবকিছু করাচ্ছে। যাদের মাধ্যমে অমুসলিম শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে তারা সবাই মুসলিম নামেই পরিচিত। এই তথা কথিত মুসলমান নামের দাবীদারগণ কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামী লেবাছ পরে ইসলামের সাথে দুশমনি করছে।

মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে, মুসলিম নাম ধারণ করে, ইসলামী লেবাছ ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে নেতার আসনে বসে একশ্রেনীর মানুষ পার্থিব স্বার্থের কারণে ইসলামের সাথে শত্রুতা করছে। মুলতঃ এরা অমুসলিম শক্তির হাতের পুতুল মাত্র। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আ'রাফে বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ–وَ كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ–لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌوَّ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ–وَكَذَالِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ–

যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহীর

ভূমিকা অবলম্বন করেছে, তাদের জন্যে আসমানের দরোজা কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততোখানি অসম্ভব যতোখানি অসম্ভব সুঁইয়ের ছিদ্র পথে উটের প্রবেশ। অপরাধীদের জন্য প্রতিফল এমনই হওয়া উচিত। তাদের জন্য আগুনের শয্যা ও চাদর নির্দিষ্ট আছে। আমরা জালেমদেরকে এরকম প্রতিফলই দিয়ে থাকি? (সূরা আল আ'রাফ)

পৃথিবীতে যারা ইসলামের সাথে বিরোধীতা করছে, ইসলামকে শুধু মসজিদ মাদ্রাসা, খানকায় বন্দী করার চক্রান্ত করছে, তাদের জন্যে আকাশের দরোজা খোলা হবে না। মুখে তারা যতেই ইসলামের কথা বলুক না কেন, তাদের ভন্ডামী আল্লাহ ভালোই বোঝেন। তাদের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব। সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে যেমন কখনো উট প্রবেশ করতে পারবে না, তেমনি ওই সমস্ত লোকের পক্ষে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না। এরা যতই নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করুক না কেন-আসলে এরা অবশ্যই জাহান্নামী হবে।

মহান আল্লাহ কোরআনে এক শ্রেণীর মানুষের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তথা শুকর ও কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন। এরা হলো ওই সমস্ত মানুষ, যারা পৃথিবীতে পার্থিব যোগ্যতার ভিত্তিতে কেউ বুদ্ধিজীবী, কেউ কবি, কেউ সাহিত্যিক, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ প্রফেসর-প্রিন্সিপাল, কেউ অভিনেতা সেজে বসেছে। পার্থিব ক্ষেত্রে এরা যথেষ্ট জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে এরা একেবারে গন্ড মূর্খের ন্যায়। এদের মাথায় ঘিলু আছে, তা দিয়ে পৃথিবীতে কি করে উন্নতি করা যায় শুধু সেই চিন্তাই করে। আল্লাহ, রাসূল, কোরআন-হাদীস সম্পর্কে এরা মুহূর্ত কাল ভেবে দেখেনা। এদের চোখ আছে, তা দিয়ে পৃথিবীর রঙ্গ-রস তারা দেখে কিন্তু আল্লাহর বিধান মানুষের কাছে কি দাবী করে, তা ওরা দেখে না। এদের কান আছে, সে কান দিয়ে পৃথিবীতে সব কথা শুনতে পারে কিন্তু আল্লাহ-রাসুলের কথা শুনে না। এরাই হলো জাহান্নামী। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ-لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّيَفْقَهُوْنَ بِهَا-وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَّيُبْصِرُوْنَ بِهَا-وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَّيَسْمَعُوْنَ بِهَا-اُولٰئِكَ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ-اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ-

আমরা জাহান্নামের জন্য বহু জ্বীন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, তাদের কাছে অন্তর আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না। তাদের চোখ আছ তবুও তারা দেখেনা। তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তার শুনেনা। তারা জন্তু জানোয়ারের মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট, এরাই গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত। (সূরায়ে আরাফ-১৭৯)

জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর

জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সূরা বাকারায় বলা হয়েছে-

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ-اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ-

তোমরা জাহান্নামের ঐ আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। যা অবিশ্বাসী কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। (বাকারা-২৪)

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা নিজেরা চেষ্টা করে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচার জন্যে। নিজেরা নামাজ কালাম আদায় করে, যাকাতও দান করে, হজ্জও করে কিন্তু নিজের অধিনস্ত ছেলে-মেয়েকে মোটেও তাগিদ দেয় না নামাজ-কালামের জন্যে। শুধু তাই নয়-নিজে মুখে দাড়ি রেখে, মাথায় টুপি দিয়ে নিজের বেপর্দা সুন্দরী মেয়েকে সাথে নিয়ে শপিং করতে বের হয়। মেয়েকে পর্দা করতে বলে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা তাহরীমে বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّايَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَااَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ-

হে ঈমানদারগণ! নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে সে আগুন হতে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে অত্যন্ত কর্কশ, রুঢ় ও নির্মম স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। যারা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। যে আদেশ তাদেরকে দেয়া হোক না কেনো, তা ঠিক ঠিকভাবে পালন করে।

এই আয়াতের বক্তব্য সম্পর্কে মানুষের মনে একটা প্রশ্ন জাগে, জাহান্নামের আগুনে পাথর পুড়ানো হবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, এক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর দাসত্ব বাদ দিয়ে বিভিন্ন বস্তুর দাসত্ব বা পূজা করে। মাটির তৈরী, পাথরের তৈরী মূর্তি বানিয়ে তার কাছে নিজের আশা-আকাংখা, কামনা বাসনা জানায়, তাদের কাছে বিপদ- আপদ থেকে মুক্তি চায়। এই শ্রেণীর মানুষগুলোর ধারণা পরকালে

এই মূর্তি তাদের জন্যে সুপারিশ করে তাদের দোযখ থেকে বাঁচাবে। মহান আল্লাহ ওদের সাথে সাথে ওদের মূর্তিগুলোকেও জাহান্নামে পাঠিয়ে ওদেরকে দেখাবেন। দেখো, তোমরা যাদের দাসত্ব করতে তারা নিজেরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেনি সুতারাং তোমাদেরকে কি করে রক্ষা করবে?

তাছাড়া আগুনের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করলে সে পাথর পুড়ে লাল হয়ে অধিক তাপ বিকিরণ করে, আগুনের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। মূর্তিপুজকগণ যাতে বেশী উত্তাপে অধিক আযাব ভোগ করতে পারে, সে কারণেও আগুনে পাথর নিক্ষেপ করা হতে পারে। প্রকৃত সত্য যে কি তা আল্লহই অবগত আছেন। সেদিন আল্লাহ রব্বুল আলামীন ফেরেশ্তাদের নির্দেশ দেবেন–

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ-ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ-ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ-

ধরো এবং গলায় ফাঁস পরিয়ে দাও তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো, আর সত্তর হাত দীর্ঘ শিকল দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দাও। (আল- হাক্কাহ্-৩০-৩২)

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

اِنْطَلِقُوْا اِلَى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ-لاَظَلِيْلٍ وَّلاَ يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ-اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ-كَاَنَّه جِمٰلَتٌ صُفْرٌ-

(অপরাধীদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে) চলো, সে ছায়ার দিকে যা তিনটি শাখা বিশিষ্ট। যেখানে না (শীতল) ছায়া আছে আর না আগুনের লেলিহান শিখা হতে রক্ষাকারী কোন বস্তু। সে আগুন প্রসাদের ন্যায় বিরাট স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। তা এমনভাবে লাফাতে থাকবে, দেখলে মনে হবে যেন হলুদ বর্ণের উট। (মুরসালাত– ৩০-৩৩)

জাহান্নামীদের গলায় শিকল লাগানো হবে

পবিত্র কোরআনের সুরা মুমিনের ৭১-৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ-يُسْحَبُوْنَ-فِى الْحَمِيْمِ-ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ-

যখন তাদের গলায় শিকল ও জিঞ্জির লাগানো হবে, তখন তা ধরে টগবগ করে ফুটন্ত পানির দিকে টানা হবে এবং পরে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

পবিত্র কোরআনের সূরা সা'দে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّمَابٍ-جَهَنَّمَ-يَصْلَوْنَهَا-فَبِئْسَ الْمِهَادُ-هٰذَا-فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ-وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِه اَزْوَاجٌ-

আর খোদাদ্রোহী মানুষদের নিকৃষ্ট পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে তারা (অনন্তকাল) জ্বলবে। এটা অত্যন্ত খারাপ স্থান, প্রকৃত পক্ষে এ স্থান তাদের জন্যেই । অতএব সেখানে তারা স্বাদ গ্রহণ করবে টগবগে ফুটন্ত পানি, পূঁজ, রক্ত, এবং এ ধরণের আরো অনেক কষ্টের। (সূরা সাদ-৫৫-৫৮)

মহান আল্লাহর কোরআনে সূরা হজ্জে বলা হয়েছে-

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ-يُصْهَرُبِه مَافِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ-وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ-كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا-وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ-

জাহান্নামীদের মাথার ওপরে প্রচন্ড গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তাদের পেটের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তু ও চামড়া মুহূর্তের মধ্যে গলে যাবে এবং তাদের জন্য লোহার ডান্ডাসমূহ থাকবে। যখনই তারা শ্বাসরোধক অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের হবার চেষ্টা করবে তখনই তাদেরকে প্রতিহত করা হবে এবং বলা হবে দহনের শাস্তি ভোগ করতে থাক। (হজ্জ-১৯-২২)

এই ধরনের কঠিন আযাব থেকে কোন অবাধ্য পাপীগণ রেহায় পাবে না। সবাইকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতেই হবে। শুধু ব্যতিক্রম হবে বিশ্বনবীর চাচা আবু তালিবের ক্ষেত্রে। কারণ তিনি বিভিন্ন সময়ে বিশ্বনবীকে সাহায্য সহযোগিতা দান করেছেন। ইসলামের সাথে তিনি যেমন শত্রুতা করেননি তেমনি ইসলাম গ্রহণও করেননি। বিশ্বনবী বলেন, 'জাহান্নামীদের মধ্যে সব চেয়ে অল্প শাস্তি হবে আবু তালিবের, তার পায়ে শুধু জাহান্নামের তৈরী এক জোড়া জুতো পরিয়ে দেয়া হবে। এতেই তার মাথার মগজ গলে নাক-কান দিয়ে চুইয়ে পড়বে।' (বোখারী)

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই (জাহান্নামে) কাফেরদের চামড়া বিয়াল্লিশ গজ পুরু হবে এবং এক একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। জাহান্নামে একজন জাহান্নামী যে স্থান জুড়ে অবস্থান করবে তা মক্কা হতে মদীনার দুরত্বের সমান। (তিরমিজী)

জাহান্নামের শাস্তির যে ধরণ, তা পুরোপুরি অনুভব করতে হলে দৈহিক আকার আকৃতির পরিবর্তনের প্রয়োজন, এটা স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধিরও দাবী। আকার আকৃতি যতো বড়ো হয় শাস্তির তীব্রতাও বেশী অনুভূত হয়। আল্লাহ পাপীদেরকে আকার আকৃতি বৃদ্ধি করে দিবেন, যেনো আল্লাহর শাস্তি পুরোপুরি অনুভব করতে পারে। হাদীসে তুলনা করার জন্য কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে যেমন বিয়াল্লিশ গজ, ওহুদ পাহাড়, ইত্যাদি। কারণ কোরআন ও হাদীসে আখিরাতের নিয়ামত ও আযাবের বর্ণনা পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু দ্বারা দৃষ্টান্ত দেয়া হযেছে। যদিও পরকালের কোন বস্তুর তুলনাই পৃথিবীতে হতে পারেনা। কারণ পৃথিবী ও আখিরাতের বস্তু এক নয়, তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। তবুও তুলনা না করে উপায় নেই।

কেননা যে ব্যক্তি কোন দিন জিরাফ দেখেনি তাকে জিরাফ সম্বন্ধে বুঝাতে হলে বলতে হবে যে জিরাফ ঘোড়ার মতই তবে গলাটা অনেক লম্বা। যদিও জিরাফ এবং ঘোড়া এক নয় তবু দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে ধারণাটা কাছাকাছি নেবার জন্য। তেমনিভাবেই পরকালের সমস্ত দৃষ্টান্ত দুনিয়ার সাথে তুলনা করে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَ هَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَبَ-اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا-

যখন তাদের দেহের চামড়া আগুনে পুড়ে গলে যাবে, তখন (সাথে সাথে) সেখানে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেবো; যেনো তারা আজাবের স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত আল্লাহ বড়োই শক্তিশালী এবং নিজের ফয়সালা সমূহ কার্যকরী করার কৌশল খুব ভালো করেই জানেন। (সুরা নিসা–৫৬)

চামড়া যে পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং পুড়ে যাচ্ছে, পুনরায় আবার তা তৈরী হচ্ছে, এ অনুভূতি কখনো জাহান্নামীদের থাকবেনা। জাহান্নামীদের প্রতি সেকেন্ডে কয়েকশ'বার চামড়া পরিবর্তন করা হবে কিন্তু জাহান্নামীগণ মনে করবে যে, তার সে পুরানো চামড়াই শরীরে আছে এবং তা অবিরাম পুড়ে চলছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ-وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ-لَّابَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ-

তারা গরম বাস্প, টগবগ করে ফুটন্ত পানি এবং কালো ধূয়াঁর ছায়ার মধ্যে থাকবে। তা (কখনো) না ঠান্ডা হবে, না শান্তিদায়ক। (ওয়াকিয়া ৪২-৪৪)

জাহান্নামীগণ জাহান্নামে কালো আগুনের মধ্যে অবস্থান করবে, একথা আল্লাহর রাসূলও বলেছেন, 'আগুনকে এক হাজার বছর তাপ দেয়া হলো তখন আগুন লালবর্ণ ধারণ করলো। আবার এক হাজার বছর তাপ দেয়া হলো তখন আগুন কালোবর্ণ ধারণ করলো। সে জন্যই জাহান্নামের আগুন কালো এবং অন্ধকারময়। (তিরমিজি)

জাহান্নামীগণ একদল আরেক দলকে অভিশাপ দেবে

যারা জাহান্নামে যাবে তারা একদল আরেক দলকে দোষ দেবে যে, আমরা তোমাদের কারণেই আজ এই কঠিন শাস্তির স্থান জাহান্নামে এসেছি। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا-حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا-قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ-

প্রত্যেকটি দল যখনই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, নিজের সঙ্গের দলটির উপর অভিশাপ দিতে দিতে অগ্রসর হবে। শেষ পর্যন্ত সকলেই যখন সেখানে সমবেত হবে, তখন প্রত্যেক পরবর্তী লোক পূর্ববর্তী লোকদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের রব! এ লোকেরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। এখন তাদেরকে আগুনে (আমাদের চেয়ে) দ্বিগুন শাস্তি দাও। আল্লাহ বলবেন, সকলের জন্যই দ্বিগুন আজাব কিন্তু তোমরা তা বুঝবে না। (আ'রাফ–৩৮)

সকলের জন্যই দ্বিগুন আজাব এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, অপরাধীগণ সর্বদাই নিজে অপকর্ম করে এবং অন্যদের করতে উৎসাহ দেয়। যেহেতু প্রতিটি অপকর্মই বাহ্যিক চাকচিক্যময় তাই তার উৎসাহে বিপুল সংখ্যক লোক সাড়া দেয়। আবার তাদের দেখাদেখি পরবর্তীতে আরেকদল অপরাধ প্রবণ হয়ে যায়। এমনি করে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক অপরাধীদের দল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রত্যেকটি দলই পূর্ববর্তী দলকে অনুসরণ করেই অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে পড়ে এবং অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত হয়। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক দলকেই দ্বিগুণ শাস্তি দেবেন। কারণ একদিকে যেমন তারা পূর্ববর্তী দলের অনুসারী অপরদিকে তারা তাদের পরবর্তী দলের পথ প্রদর্শক। এ কথা গুলোই আল্লাহ পবিত্র কালামে অন্যভাবে বলেছেন–

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ-وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ-

আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু। তিনি অন্ধকার হতে আলোর দিকে লোকদেরকে পথ দেখান এবং কাফেরদের বন্ধু খোদাদ্রোহী লোকজন তারা লোকদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে পথ দেখায়। (বাকারা-২৫৭)

পৃথিবীতে নানা ধরনের দল রয়েছে। এসব দলের মধ্যে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি দল আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে তাদের কর্মীদের পরিচালিত করে থাকে। আর অধিকাংশ দলই মানুষের বানানো আদর্শের ভিত্তিতে কর্মীদের পরিচালিত করে। এসব বাতিল দলের নেতা-কর্মীরা যখন জাহান্নামে যাবে তখন তারা তাদের নেতাদের দোষ দেবে।

কর্মীরা নেতাদের প্রতি অভিশাপ দেবে

এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَ نَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ-رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا-

(যখন জাহান্নামীদেরকে আগুনে পুড়ানো হবে) তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের সরদার ও নেতাদের আনুগত্য করেছি, তারা আমাদেরকে সঠিক সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। হে রব ! এ লোকদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের ওপর কঠিন অভিশাপ বর্ষন করো। (আহযাব- ৬৭-৬৮)

জাহান্নামীগণ জাহান্নামে জ্বলতে জ্বলতে অসহ্য হয়ে যাবে। তখন চীৎকার করে বলতে থাকবে-

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنَ اَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الاَسْفَلِيْنَ-

হে পরোয়ারদেগার! সেই জ্বিন ও মানুষদেরকে আমাদের সামনে এনে দাও, যারা আমাদের গোমরাহ করছিলো। আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের তলায় রেখে দলিত মথিত করবো, যেনো তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। (হামীম সিজদাহ্-২৯)

জাহান্নামীদের অনুভূতি তীব্র হবে। তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং সেদিন বুঝবে যে অন্ধভাবে নেতাদের অনুসরণ করা কতো বড়ো ভ্রান্তনীতি ছিলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ-اِذْنُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

আর এই বিভ্রান্ত লোকেরা (নিজেদের নেতাদেরকে লক্ষ্য করে) বলবে, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের মর্যাদা দিচ্ছিলাম। (শুয়ারা– ৯৭–৯৮)

জাহান্নামীদের নিকৃষ্ট খাদ্য

জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ-طَعَامُ الاَثِيْمِ-كَالْمُهْلِ-يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ-كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ-

যাক্কুম গাছ জাহান্নামীদের খাদ্য হবে; তিলের তেলচিটের মতো। পেটে এমনভাবে উথলিয়ে উঠবে যেমন টগবগ করে পানি উথলিয়ে উঠে। (দোখান– ৪৩-৪৬)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ-

অতঃপর পান করার জন্য তাদের ফুটন্ত পানি দেয়া হবে। (ছাফ্‌ফাত–৬৭)

সূরা-গাশিয়ায় বলা হয়েছে–

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ-لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ-لاَّيُسْمِنُ وَلاَيُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ-

টগবগ করে ফুটন্ত কূপের পানি তাদেরকে পান করানো হবে। কাঁটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া অন্য কোন খাদ্য তাদের জন্য থাকবেনা। তা দেহের পুষ্টি সাধনও করবেনা এবং ক্ষুধার উপশমও হবে না । (গাশিয়া– ৫-৭)

আল্লাহর আদালতের বাম পাশে যারা অবস্থান করবে তারা বড়ই হতভাগ্য এবং এরাই হবে জাহান্নামের জ্বালানি। পৃথিবীতে এরা ইসলামী বিধি বিধানের তোয়াক্কা করেনি। এরা ধারণা করতো মৃত্যুর পরে কোন জীবন নেই। মিথ্যায় ভরপুর ছিল এদের জীবন। অসৎ কাজই ছিল এদের পেশা। কোরআন-হাদীস সম্পর্কে এরা ছিল

উদাসীন। যে কোন পথে যে কোনভাবে এরা টাকা উপার্জন করতো। হারাম-হালাল বলে কোন কথা এদের জীবনে ছিল না। অপরের সম্পদ এরা অন্যায়ভাবে ভোগ দখল করতো। কোরআন-হাদীস অনুযায়ী যারা জীবন-যাপন করতো, তাদেরকে এরা উপহাস করতো।

এরা পৃথিবীতে নিজের শক্তির মহড়া দিয়ে অন্যায় কাজ করতো। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে দুর্বলদের উপর অত্যাচার করতো। নিজেরা ভোগ বিলাসে লিপ্ত থাকলেও অভাবীদের দিকে এদের দৃষ্টি ছিল না। এরা সেদিন কঠোর শাস্তির মধ্যে অবস্থান করবে। তাদেরকে আযাবের পর আযাব দেয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ-وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ-لاَّبَارِدٍ وَّلاَكَرِيْمٍ-اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِيْنَ-وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ-اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًاءَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ اَوَابَاؤُنَا الاَوَّلُوْنَ-قُلْ اِنَّ الاَوَّلِيْنَ وَالاخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ-ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَاا لضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ-لاكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ-فَمَالِئُوْنَ مِنْهَاالْبُطُوْنَ-فَشرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ-فَشرِبُوْنَ شَرْبَ الْهِيْمِ-

এরা অবস্থান করবে উত্তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। তাদেরকে অচ্ছাদিত করে রাখবে উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ ধুম্ররাশি যা কখনো শীতল ও আরামদায়ক হবে না। এরা ওই সমস্ত মানুষ–যারা পৃথিবীর জীবনে ছিল সুখী সচ্ছল। তাদের সুখী সচ্ছল জীবন তাদেরকে লিপ্ত করেছিল পাপ কাজে। সে সব পাপ কাজ তারা করতো জিদ ও অহংকারের সাথে। তারা বলতো, মৃত্যুর পর তো আমরা কংকালে পরিণত হবো। মিশে যাবো মাটির সাথে। তারপর আবার কি করে আমরা জীবিত হবো? আমাদের বাপ-দাদাকেও এভাবে জীবিত করা হবে? হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, পরবর্তী এবং পূর্ববতী সকলকেই একদিন উপস্থিত করা হবে। তার জন্য সময় কালও নির্ধারিত হয়ে আছে। হে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীর দল, তোমরা জাহান্নামে যকুম বৃক্ষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে। তা দ্বারাই তোমরা উদরপূর্ণ করবে। তারপর তৃষ্ণার্ত উটের মতো তারা পেট ভরে পান করবে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি? (সূরা ওয়াকিয়া-৪২-৫৫)

জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে রক্ত, পূজ, ক্ষরণ খেতে দেয়া হবে আর দেয়া হবে 'যকুম' ফল। এই ফল অত্যন্ত কাঁটা যুক্ত ও বিষাক্ত হবে। তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হবে। যকুম খওয়ার সাথে সাথে পেটে ভয়ংকর যন্ত্রণা শুরু হবে। আর্তচিৎকার করতে থাকবে পাপীগণ। যকুম ফলের ক্রিয়ায় তাদের পেটের নাড়িভূড়ি গলে মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাবে- কিন্তু মৃত্যু হবে না।

জাহান্নামীগণ জান্নাতীদের কাছে খাদ্য চাইবে

জাহান্নামীরা কিভাবে জান্নাতীদের কাছ থেকে খাদ্য চাইবে সে সম্পর্কে আল্লাহ শোনাচ্ছেন-

وَنَادَى أَصْحٰبُ النَّارِ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْمِمَّارَزَقَكُمُ اللّٰهُ-قَالُوْااِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ-

জাহান্নামীগণ জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদেরকে সামান্য পানি দাও কিংবা আল্লাহ তোমাদের যে রিজিক দিয়েছেন তা হতে কিছু আমাদের দিকে নিক্ষপ করে দাও। জবাবে জান্নাতীগণ বলবে, আল্লাহ তা'য়ালা এ দুটি বস্তুই কাফেরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। (আ'রাফ-৫০)

উপরের আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী যেমন স্থান-কাল ও পাত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ কিন্তু আখিরাত স্থান-কালের সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে। কেননা জান্নাতের পরিধি যেমন বিশাল ঠিক তেমনিভাবে জাহান্নামের পরিধিও বিশাল। তবুও এ দু'প্রান্ত থেকে একজন অপরজনের অবস্থা অবলোকন করতে পারবে এবং পরস্পর কথাও বলবে, তাতে তাদের দৃষ্টিশক্তি বা কণ্ঠস্বরের কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না।

জাহান্নামীদেরকে যখন ফেরেশতারা এক হাতে চুলের মুঠি এবং অন্য হাতে পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে নিয়ে যাবে তখন জাহান্নামের পাহারাদারগণ জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সুসংবাদ দাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী পৌঁছেনি? তখন কাফেরগণ বলবে হ্যাঁ, পৌঁছেছিলো কিন্তু আমরা তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করতাম এবং মিথ্যা মনে করতাম। তখন আফসোস করবে এবং বলবে-

وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ-

হায়! আমরা যদি শুনতাম এবং অনুধাবন (জ্ঞান দিয়ে চিন্তা ভাবনা) করতাম, তবে আমরা আজ দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনে নিক্ষিপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল হতাম না। (মুল্ক-১০)

জাহান্নামীগণ পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে

সূরা আনয়ামে বলা হয়েছে–

وَلَوْتَرى اِذْوُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِايتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

হায়! সে সময়ের অবস্থা যদি তুমি দেখতে পারতে, যখন তাদেরকে জাহান্নাদের কিনারায় দাঁড় করানো হবে; তখন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম এবং সেখানে আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা মনে না করতাম ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হতে পারতাম! (আনয়াম–২৭)

তাদের এ আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আল্লাহ সরাসরি তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكذِبُوْنَ-

তাদেরকে যদি পূর্ববর্তী জীবনের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয় তবুও তারা সে সব কাজই করবে যা হ'তে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তো সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাবাদী। (আনয়াম-২৮)

সূরা যুমারে বলা হয়েছে, যে সব লোক কুফূরী করেছিলো তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছাবে তখন তার (অর্থাৎ জাহান্নামের) দরজাগুলো উন্মুক্ত করা হবে এবং তার কর্মচারীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট তোমাদের নিজেদের মধ্যে হতে এমন কোন রাসূল কি আসেনি, যে তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াত সমুহ শুনিয়েছে এবং তোমাদেরকে এ বলে ভয় প্রদর্শন করেছে যে, এ দিনটি অবশ্যই একদিন তোমাদেরকে দেখতে হবে? তারা বলবে–হ্যাঁ, এসেছিলো !

মানুষ যখন হতাশ ও পেরেশান হয়ে যায় তখনই তার মুখ দিয়ে হতাশাব্যঞ্জক কথা বের হয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তটি তার নমুনা। তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ শোনাচ্ছেন–

قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ-

তারা বলবে হে আমাদের রব! তুমি নিশ্চয়ই আমাদের দু'বার মৃত্যু ও দু'বার জীবন দান করেছো। এখন আমরা আমাদের অপরাধ সমুহ স্বীকার করে নিচ্ছি। এখন এখান (জাহান্নাম) থেকে বের হবার কোন পথ আছে কি ? (আল্-মুমিন্-১১)

দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবনদান অর্থ মানুষ অস্তিত্বহীন ছিলো অর্থাৎ মৃত ছিলো আল্লাহ জীবন দান করলেন আবার মৃত্যু দিবেন এবং পুনরায় কিয়ামতের দিন জীবিত করে উঠাবেন। এ কথা কয়টি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুরা বাকারায় স্পস্ট করে বলেছেন–

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ-ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

তোমরা আল্লাহর সাথে কেমন করে কুফুরী করতে পারো! অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন- মৃত, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। আবার মৃত্যু দিবেন এবং পুনরায় জীবন দান করে উঠাবেন। তারপর তার দিকেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (বাকারা-২৮)

অপরাধীগণ প্রথম তিনটি অবস্থা অবিশ্বাস করতো না, কেননা এ তিনটি অবস্থা তাদের চোখের সামনেই ঘটতো। কিন্তু শেষাবস্থা তারা প্রত্যক্ষ করতে পারেনি বলে উপহাস করে উড়িয়ে দিতো। কেননা শেষ অবস্থার খবর একমাত্র নবী রাসূলগণই দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন কার্যত যখন এ অবস্থা ঘটে যাবে তখন তারা স্বীকার করবে এবং কাকুতি মিনতি করবে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসার জন্য। সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে–

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا-رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ-

সেখানে (জাহান্নামে) তারা চীৎকার করে বলবে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এখান হতে বের করে নাও যেনো আমরা নেক আমল করতে পারি। সে আমল থেকে ভিন্নতর যা আমরা পূর্বে করছিলাম। (ফাতির–৩৭)

অতঃপর তাদেরকে প্রতিউত্তরে বলা হবে–

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَ كُمُ

النَّذِيْرُ-فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ-

আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি, যে শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতে? আর তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিলো । এখন (আযাবের) স্বাদ গ্রহণ করো। এখানে জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (ফাতির-৩৭)

সমস্ত কিছুর বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইবে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ-وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ-وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُئْوِيْهِ-وَمَنْ فِى الاَرْضِ جَمِيْعًا-ثُمَّ يُنْجِيْهِ-

সেদিন অপরাধীগণ চাইবে তার সন্তান, স্ত্রী, ভাই, এবং সাহায্যকারী নিকটবর্তী পরিবার, এমনকি দুনিয়ার সব মানুষকে বিনিময় দিয়ে হলেও নিজেকে আজাব হতে বাঁচিয়ে নিতে। (আল্ মা'য়ারিজ-১১-১৪)

সূরা আল্-মু'মিনুনে বলা হয়েছে-

فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلاَيَتَسَاءَلُوْنَ-

তখন তাদের মধ্যে আর কোন আত্মীয় থাকবেনা এমন কি পরস্পর দেখা হলেও (কেউ কাউকে) জিজ্ঞেস করবে না। (আল্ মু' মিনুন-১০১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا-هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ-اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لاَتُبْصِرُوْنَ-اِصْلَوْهَافَاصْبِرُوْا اَوْلاَتَصْبِرُوْا-سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ-اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাদেরকে বলা হবে যে, এই সে আগুন যাকে তোমরা ভিত্তিহীন গুজব মনে করেছিলে। এবার বলো, এটা কি যাদু? না তোমারা কিছুই দেখোনা? এবার যাও

এর মধ্যে ভস্ম হ'তে থাকো। এখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করো বা না করো সবই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদের সে রকম প্রতিফলই দেয়া হচ্ছে যা তোমরা আমল করেছো। (তুর-১৩-১৬)

সূরা হাদীদের ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

فَالْيَوْمَ لَايُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-مَأْوكُمُ النَّارُ-هِيَ مَوْلكُمْ-وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ-

(যখন ফেরেশতাগণ জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, তখন বলবে) আজ তোমাদের নিকট হ'তে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং যারা পৃথিবীতে (প্রকাশ্য দাম্ভিকতার সাথে আল্লাহর আয়াত গুলো) অস্বীকার করেছিলো, (তাদেরকেও বিনিময় নিয়ে মুক্তি দেয়া হবে না) তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সে জাহান্নামই তোমাদের খোঁজ খবর গ্রহণকারী অভিভাবক। কতো নিকৃষ্ট পরিণতি।

জান্নাতের বিশালতা আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়

কেবলমাত্র মুত্তাকী লোকগুলোই সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে আর সে সাফল্য হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করে তাঁরা নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত লাভ করবে। (মুত্তাকী শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের শর্ত' শিরোণাম পড়ুন)

জান্নাতের বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

سَابِقُوْا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ-

তোমরা একে অপরের সাথে সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলক অগ্রসর হও। তোমার প্রভূর ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে, যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। (সূরা হাদীদ-২১)

অগণিত নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত

হাদীসে আছে আল্লাহ যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দেবেন তাকেও এ পৃথিবীর মতো দশ পৃথিবীর সমান জান্নাত দেবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

لِـهٖ‌ـوَاِذَا رَاَيْـتَ ثَـمَّ رَاَيْـتَ نَـعِـيْـمًـا وَّمُـلْـكًـا كَـبِـيْـرًا–

সেখানে (জান্নাত) যে দিকে তোমরা তাকাবে শুধু নিয়ামত আর নিয়ামত এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমরা সেখানে দেখতে পাবে। (সূরা দাহ্‌র২০)

গোটা জান্নাত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে

জান্নাতে সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। ফুল-ফলের সমাহার এবং সৌন্দর্য শ্যামলতা কখনো ম্লান হবে না। এমন কি গোটা জান্নাত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা দাহ্‌র-এর ১৩ নং আয়াতে বলেন–

لَايَـرَوْنَ فِـيْـهَا شَـمْـسًا وَّلَازَمْـهَـرِيْـرًا–

তাদেরকে সেখানে (জান্নাতে) না সূর্যতাপ জ্বালাতন করবে না শৈত্য প্রবাহ।

জান্নাতীগণ কোন দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে না

পৃথিবীতে মানুষ যতো বিত্তশালী হোক এবং যতো সুখ-শান্তিই ভোগ করুক না কেনো তবু তার কোন না কোন দুঃখ বা অশান্তি থাকবেই, কোন মানুষই সম্পূর্ণ সুখী নয়। কিন্তু জান্নাতে কোন দুঃখই থাকবে না, এমন কি পৃথিবীতে মাল্টি বিলিয়নার হয়েও আরো বেশী পাওয়ার জন্য এবং ভোগ করার জন্য দুঃখের শেষ থাকে না । পক্ষান্তরে জান্নাতীগণ-যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দেয়া হবে তারও কোন অনুতাপ বা দুঃখ থাকবে না। আল্লাহ নিজেই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন–

لَايَـمَـسُّـهُـمْ فِـيْـهَا نَـصَـبٌ وَّمَـا هُـمْ مِـنْـهَا بِـمُـخْـرَجِـيْـنَ–

তারা সেখানে কখনও কোন দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে না এবং কোনদিন সেখান থেকে তাদেরকে বের করেও দেয়া হবে না। (সূরা হিজর-৪৮)

পবিত্র কোরআনের অন্যস্থানে রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ–لَايَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ–

(জান্নাতীগণ বলবে) তিনি আমাদেরকে নিজের অনুগ্রহে চিরন্তনী আবাসস্থল দান করেছেন, এখন আমাদের কোন দুঃখ এবং ক্লান্তি নেই। (ফাতির-৩৫)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকবে, দারিদ্র ও অনাহারে কষ্ট পাবে না। তাদের পোষাক পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবনও শেষ হবে না। (মুসলিম)

জান্নাতীগণ অশোভন কথা শুনতে পারে না

পৃথিবীতে যতো ঝগড়া ফ্যাসাদ সমস্তই স্বার্থপরতা, অহংকার ও হিংসার কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। জান্নাতে স্বার্থপরতা, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি থাকবে না। তাই সেখানে গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা, ঝগড়া-বিবাদ, অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি কিছুই থাকবেনা। সেখানে শুধু সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে। জান্নাতীরা জান্নাতে বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

لاَيَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلاَ تَأْثِيْمًا-اِلاَّ قِيْلاً سَلمًا سَلمًا-

সেখানে তারা বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পাবে না। যে কথাবার্তা হবে তা ঠিকঠিক ও যথাযথ (সম্প্রীতি পূর্ণ) হবে। (ওয়াকিয়া -২৫-২৬)

ফেরেশতাগণ জান্নাতীদেরকে সালাম জানাবেন

ফেরেশতাগণ জান্নাতীদেরকে সালাম জানাবেন, আবশ্য এ ব্যাপারে জান্নাতীদেরকে জান্নাতের দ্বার রক্ষীগণই সুসংবাদ প্রদান করবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

حَتَّى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خلِدِيْنَ-

অতপর যখন তারা সেখানে (প্রবেশ করার জন্য) আসবে, তখন দ্বার রক্ষীগণ তাদের জন্য দরজাসমুহ খুলে দিবে এবং জান্নাতীদের সম্বোধন করে বলবে, আপনাদের প্রতি অবারিত শান্তি বর্ষিত হোক। অনন্ত কালের জন্য এখানে প্রবেশ করুন। (যুমার-৭৩)

জান্নাতীগণ মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না

পৃথিবীতে যতোগুলো বাস্তব ও চাক্ষুষ বস্তু আছে তার মধ্যে মৃত্যু একটি। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষ পার্থিব কোন বস্তু থেকেই অমনোযোগী ও গাফেল নয় একমাত্র মৃত্যু ছাড়া। এমনকি যদিও আমাদের প্রত্যেককেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। এ বাস্তবতার পরও মৃত্যুকে আমরা ভীতির চোখে দেখি এবং মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াবার ব্যর্থ প্রয়াস পাই। এ ভীতিকর অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র নিশ্চয়তা থাকবে জান্নাতীদের জন্য। জান্নাতে কখনো মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلاَّ الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى-وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ-

সেখানে তারা আর কখনো মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না। পৃথিবীতে একবার যে মৃত্যু হয়েছে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে দিবেন। (সূরা দোখান- ৫৬)

জান্নাতীগণ অসুস্থ হবে না

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবে-হে জান্নাতীগণ! এখন আর তোমরা কোনদিন অসুস্থ হয়ে পড়বে না, সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান থাকবে। কোনদিন আর তোমাদের মৃত্যু হবে না অনন্তকাল জীবিত থাকবে। সর্বদা যুবক হয়ে থাকবে কখনো তোমরা বুড়ো হবে না। সর্বদা অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করবে কোনদিন শেষ হবে না এবং কখনো দুঃখ অনাহারে থাকবেনা। (মুসলিম-তিরমিজী)

পৃথিবীতে কোন জিনিস পেতে হলে বা ভোগ করতে চাইলে সে জিনিসের জন্য চেষ্টা শ্রম ও কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা বা সম্পদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু জান্নাতে ইচ্ছে হওয়া মাত্রই সে জিনিস তার সামনে উপস্থিত পাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা সাক্ষী দিচ্ছেন-

وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ-نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ-

সেখানে তোমরা যা কিছু চাও পাবে এবং যার ইচ্ছে করবে সাথে সাথে তাই হবে। এটা হচ্ছে ক্ষমাশীল ও দয়াবান আল্লাহর তরফ হতে মেহ্‌মানদারী। (সূরা হা-মীম-আস সিজদা ৩০-৩১)

জান্নাতীগণ ইচ্ছে অনুযায়ী ভোগ করবে

আল্লাহর কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-

وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ-

এবং আমি জান্নাতীদেরকে তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী ফল ও গোশ্‌ত প্রদান করতে থাকবো। (তুর-২২)

এ দান স্থান ও কালের সাথে সীমাবদ্ধ হবে না, নিয়মিতভাবে চিরদিন প্রদান করা হবে। সূরা মারয়াম-এর ৬২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا–

এবং সেখানে তাদেরকে (নিয়মিতভাবে) সকাল সন্ধ্যা খাদ্য পরিবেশন করা হবে।

জান্নাত অনন্তকালের সুখের স্থান

পৃথিবীতে যদিও কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুখ সম্ভোগ লাভ করতে পারে না; তবুও যতোটুকু পায় তার মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত ভীত সন্ত্রস্ত্র থাকে চোর-ডাকাত, প্রতারক এবং মৃত্যুর ভয়ে। কিন্তু জান্নাতের নিয়ামত এবং সুখ ভোগ কোন দিনই কমতি বা শেষ হবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ–وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ–وَّمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ–لاَّمَقْطُوْعَةٍ وَّلاَمَمْنُوْعَةٍ–

তাদের জন্য কাঁটাহীন কুলবৃক্ষসমূহ, থরে থরে সাজানো কলা, বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী ছায়া,-সর্বদা প্রবাহমান পানি, আর খুব প্রচুর পুরিমাণে ফল থাকবে। যা কোনদিন শেষ হবে না এবং ভোগ করতে কোন বাধা বিপত্তিও থাকবে না। (ওয়াকিয়া-২৮-৩৩)

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কুল এমন কোন উত্তম ও উৎকৃষ্ট ফল, জান্নাতে যার সুসংবাদ দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো? কিন্তু সত্য কথা এই যে, জান্নাতের কুল সম্বন্ধে আর কি বলবো, এ দুনিয়ায়ও কোন কোন এলাকার এ ফল এতোই সু-স্বাদু, সুঘ্রাণযুক্ত যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ ধরনের ফল একবার মুখে দিলে ফেলে দেয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। কুল যতো উচ্চমানের হয় তার গাছের কাঁটাও ততো কম হয়ে থাকে। এ কারণেই জান্নাতের কুল ফলের এ রকম প্রশংসা করা হয়েছে যে, জান্নাতের কুলগাছসমূহ একেবারে কাঁটা শুন্য হবে অর্থাৎ জান্নাতের কুল হবে অতীব উত্তম ও উৎকৃষ্টমানের। সে ধরনের কুল পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব নয়।

জান্নাতীগণ সমবয়স্কা স্ত্রী লাভ করবে

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الاَبْوَابُ–مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ–وَعِنْدَهُمْ

قَصِرتُ الطَّرْفِ اَتْرَبٌ-هٰذَامَاتُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ-اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَه مِنْ نَّفَادٍ-

চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ যার দ্বারগুলো তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকবে। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে এবং প্রচুর ফল ও পানীয় চেয়ে পাঠাবে, আর তাদের নিকট লজ্জাবনত সমবয়স্কা স্ত্রী থাকবে। এ জিনিসগুলো এমন যা হিসেবের দিন দান করার জন্য তোমাদের নিকট ওয়াদা করা হয়েছে। এটা আমাদের দেয়া রিজিক, কোন দিন শেষ হয়ে যাবে না। (সাদ-৫০-৫৪)

হুরদের সাথে জান্নাতীদেরকে বিয়ে দেয়া হবে

হুরদের সাথে জান্নাতে জান্নাতীদের আল্লাহ বিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

متكئين على سرر مصفوفة ، و زوجنهم بحور عين-

তারা সামনা সামনিভাবে সাজানো সারি সারি আসন সমূহের উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং আমি তাদের সাথে সুনয়না হুরদেরকে বিবাহ দেবো। (তুর-২০)

হুর শব্দের অর্থ হলো সুশ্রী , অনিন্দনীয় সুন্দরী। ভাসা ভাসা ডাগর চক্ষুওয়ালা রমনী। যাদেরকে বাংলা সাহিত্যের ভায়ায় হরিণ নয়না বলা হয়। হুর সমন্ধে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুফাচ্ছিরগণ দুভাগে বিভক্ত হয়েছেন, এক দলের মতে, সম্ভবত এরা হবে সেসব মেয়ে যারা বালেগা হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলো এবং যাদের পিতা-মাতা জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়নি। একথা কেয়াস করে বলা যেতে পারে কেননা এ ধরনের ছেলেদেরকে যেমন জান্নাতীদেরকে খেদমতের জন্য নিযুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা সর্বদা বালকই থাকবে; অনুরূপভাবে এমন সব মেয়েদেরকে জান্নাতীদের জন্য 'হুর' বানিয়ে দেয়া হবে। আর তারা চিরদিন নব্য যুবতীই থেকে যাবে। অন্যদের মতে হুরগণ প্রকৃত পক্ষে স্ত্রী জাতি কিন্তু তাদের সৃষ্টি মানব সৃষ্টির চেয়ে আলাদা এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আপন মহিমায় তাদের সৃষ্টি করেছেন। সূরা রাহ্মানের ৭০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ-

(এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে) তাদের জন্য সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শনা স্ত্রীগণ।

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা হিসাবে আরেক আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاءً-فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا-عُرُبًا اَتْرَابًا-

তাদের স্ত্রীগণকে আমরা বিশেষভাবে সম্পুর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেবো। তারা হবে নিজেদের স্বামীর প্রতি আসক্ত এবং বয়সে সমকক্ষ। (ওয়াকিয়া-৩৫-৩৭)

এখানে পৃথিবীর সেসব মহিলাদের কথা বলা হয়েছে, যারা 'আমলে সালেহ' এর বিনিময়ে জন্নাতে যাবে। তারা পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ, কালা, কুৎসিত, যুবতী, বিধবা, অথবা বৃদ্ধা যাই হোক না কেন, আল্লাহ জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী, সুনয়না হিসেবে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং তারা আজীবন কুমারী থাকবে কখনো তারা বার্ধক্যে উপনীত হবে না। হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়ার মহিলারা উত্তম না হুরগণ? বিশ্বনবী বললেন, দুনিয়ার মহিলারা হুরদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম, তার কারণ কি? তিনি বললেন, তা এ কারণে যে ঐ মহিলারা নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে, ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগী করেছে। (তাবারানী)

ঐ সকল পুণ্যবতী মহিলাদের স্বামীরাও যদি জান্নাতী হয় তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দেবেন। আর ঐসব মহিলাদের মধ্যে যাদের স্বামী জাহান্নামী হবে তাদেরকে জান্নাতের ঐসব পুরুষের সাথে আল্লাহ নিজের অভিভাবকত্বে বিয়ে দিয়ে দিবেন, যাদের স্ত্রীগণ চির স্থায়ী জাহান্নামী। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, পৃথিবীতে যদি কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকে এবং সকল স্বামীই যদি জান্নাতী হয় তবে ঐ মহিলাকে আল্লাহ কোন স্বামীর স্ত্রীত্বে দিবেন? এর উত্তর অবশ্য সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণিত আরেক হাদীস থেকেই পাওয়া যায়। উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সব মহিলার একাধিক স্বামী আছে এবং ঐ স্বামীগণ যদি সকলেই জান্নাতী হোন তবে স্ত্রীকে তাদের মধ্যে কে লাভ করবে?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে মহিলাকে সুযোগ ও স্বাধীনতা দেয়া হবে। তখন তার স্বামীদের মধ্যে যে কোন একজনকে সে বাছাই করে নিবে। সে বাছাই করবে ঐ স্বামীকে যে সর্বাধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলো।

পুনরায় আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, একজন জান্নাতী পুরুষ অনেক হুর পাবে পক্ষান্তরে একজন জান্নাতী মহিলা শুধুমাত্র একজন স্বামী পাবে তাও সম্পুর্ণভাবে নিজের জন্য সংরক্ষিত থাকবে না, হুরগণ তার শরীক থাকবে। এটা কি ইনসাফ হতে পারে?

এর দুটি উত্তর হতে পারে এবং দুটিই এখানে প্রযোজ্য। প্রথমতঃ জান্নাতী একজন পুরুষ হুরপ্রাপ্তির কথা বাদ দিলে অন্যান্য যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে এবং যেসব খাদ্য ও পানীয় পাবে, তা একজন জান্নাতী মহিলাও ভোগ করতে পারবে এবং সেদিন ঐ সব মহিলার মধ্যে হতে ঈর্ষা এবং একাধিক পুরুষ ভোগের হীন মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দূর করে দিবেন। তাই তারা পরস্পর সতীন সুলভ আচরণ বা ইর্ষা পোষন করবে না।

দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীতে যেমন মহিলাগণ সংসারের পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করার জন্য সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাদের সমস্ত তৎপরতা আবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে পুরুষদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। তাদের মধ্যে অবশ্য ভিন্নধর্মী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়- যেমন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বা স্ত্রীদের প্রতি অতিরিক্ত দূর্বলতা। হয়তো জান্নাতেও সেদিন এ রকমের মন মানসিকতার কথা স্মরণ রেখেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরুষদেরকে অনেক হুর দিবেন এবং খাদেমদের কর্তৃত্ব দেয়া হবে ঐ সব পূণ্যবতী স্ত্রীগণকে । (এ ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।) ঐ সমস্ত হুর এবং স্ত্রীগণ শুধু কুমারীই হবে না এমন অবস্থায় থাকবে যে, জান্নাতীদের স্পর্শের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বীন তাদেরকে স্পর্শ করেনি বা দেখেওনি। কেননা বিচারের পূর্বে কোন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা তাই তাদেরকে দেখা বা স্পর্শ করাও সম্ভব নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আরহ্মানের ৫৬ নং আয়াতে বলেন–

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌّ–

তাদেরকে (জান্নাতীদের) পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বীন স্পর্শ করেনি।

জান্নাতের হুরদের রূপ-সৌন্দর্য

হুরদের রূপ সৌন্দর্যের উপমা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন–

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ–

তারা এমনই সুন্দরী রূপসী, যেনো হীরা ও মুক্তা। (আর-রাহমান-৫৮)

সূরা ওয়াকিয়ার ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِالْمَكْنُوْنِ–

তারা এমন সুশ্রী ও সুন্দরী হবে যেনো (ঝিনুকের মধ্যে) লুকিয়ে থাকা মুক্তা।

আরও বলা হয়েছে, 'তাদের নিকট (ভিন্ন পুরুষ হতে) দৃষ্টি সংরক্ষণকারী সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট নারীগণ থাকবে। এমন স্বচ্ছ, যেনো ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি।'

বায়যুম মাকনুন বা ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি-এ প্রসঙ্গে উম্মাহাতুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমি এ আয়াতের ব্যাখ্য আল্লাহর রাসূলের কাছে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, তাদের (হুরদের) মসৃনতা ও স্বচ্ছতা হবে সেই ঝিল্লির মতো যা ডিমের খোসা ও তার কুসুমের মাঝে থাকে।

জান্নাতে সেবকগণ হবে চিরন্তন বালক

জান্নাতীদের জন্য হুরের পাশাপাশি গিলমান থাকবে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌمَّكْنُوْنٌ-

আর তাদের সেবা যত্নে সে সব বালক দৌড়াদৌড়ির কাজে নিযুক্ত থাকবে যারা কেবলমাত্র তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। এরা এমন সুন্দর সুশ্রী হবে যেমন (ঝিনুকে) লুকিয়ে থাকা মুক্তা। (তুর-২৪)

গিলমান বা সেবকগণ হবে চিরন্তন বালক। এদের বয়স কোনদিনই বাড়বে না। এরা সেইসব বালক যারা বালেগ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে এবং তাদের মা -বাবা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। ঐ বালকগণ জান্নাতীদেরকে বাসন-কোসন, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি পরিবেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে এবং তারা পুরুষ ও মহিলা উভয় ধরনের জান্নাতীদের নিকট অবাধে যাতায়াত করবে। অথবা তারা হবে এক নতুন সৃষ্টি যাদের কে আল্লাহ আপন মহিমায় জান্নাতীদের পরিচর্যা ও সেবার জন্য সৃষ্টি করবেন। আল্লাহর কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ-اِذَارَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًامَّنْثُوْرًا-

তাদের সেবার জন্য এমন সব বালক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ী করতে থাকবে যারা চিরদিনই বালক থাকবে । তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে এরা যেনো ছড়িয়ে দেয়া মুক্তা। (দাহর-১৯)

সূরা আল্ ওয়াকীয়ার ১৭-১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ-بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ-وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ-

তাদের মজলিস সমূহে চিরন্তন ছেলেরা প্রবাহমান ঝর্ণার সূরায় ভরা পানপাত্র ও হাতলধারী সূরাভান্ড ও আবখোরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ী করতে থাকবে।

জান্নাতে জান্নাতীদের পোষাক পরিচ্ছদ

জান্নাতে জান্নাতীদের পোষাক সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–জান্নাতুল আদ্‌নে (চিরন্তনী জান্নাত) যারা প্রবেশ করবে তাদেরকে সেখানে স্বর্ণের কংকন ও মনি -মুক্তার অলংকারে সজ্জিত করা হবে এবং তাদেরকে রেশমের কাপড় পরানো হবে। আরেক আয়াতে বলা হযেছে–

عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ-وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ

তাদের ওপর সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোশাক ও মখমলের কাপড় থাকবে। এবং তাদেরকে রৌপ্যের কংকন পরানো হবে। (সূরা দাহর-২১)

সূরা আল-কাহাফে বলা হয়েছে–

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًامِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ-نِعْمَ الثَّوَابُ-وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا-

সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে। তারা সূক্ষ্ম ও গাঢ় রেশমের সবুজ পোশাক পরিধান করবে এবং উচ্চ আসনের উপর ঠেস লাগিয়ে বসবে। এটা অতি উত্তম কর্মফল ও উঁচু স্তরের অবস্থান। (কাহাফ-৩১)

আর-রাহমানের ৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مُتَّكِئِيْنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ-

তারা সবুজ গালিচা ও সুন্দর সুরঞ্জিত শয্যায় এলায়িতভাবে অবস্থান করবে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে বুঝা যায় যে উক্ত পোশাক এবং অলংকার পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই পরানো হবে। অলংকার সাধারণতঃ মহিলাগণই পরে থাকে কিন্তু পুরুষদেরকে পরানো হবে, কথাটি আমাদের নিকট একটু খটকা লাগে। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে এমন কি কুরআন

যখন অবতীর্ণ হয়েছে তখনো রাজা বাদশাহগণ , সমাজপতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ হাতে, কানে, গলায়, পোষাক পরিচ্ছদে অলংকার ও মুকুট ব্যবহার করতেন। এককালে আমাদের দেশের রাজা, বাদশাহ ও জমিদারগণ বিভিন্ন প্রকার অলংকার পরতেন। সত্যি কথা বলতে কি, তখন পুরুষদের অলংকারাদি ছিলো কৌলিন্যের প্রতীক। এ কথা সুরা যুখরুফের একটি আয়াতে প্রমাণিত হয়। যখন হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম জাঁকজমকহীন পোষাকে শুধুমাত্র একটি লাঠি হাতে ফেরাউনের দরবারে গেলেন, ফেরাউনকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে, তখন সে সভাসদকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো–

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ–

এ যদি আসমান জমিনের বাদশাহ্‌র নিকট হতে প্রেরিতই হতো তবে তাকে স্বর্ণের কংকন পরিয়ে দেয়া হলো না কেন? কিংবা ফেরেশতাদের একটা বাহিনীই না হয় তার আর্দালী হয়ে আসতো। (যুখরুফ-৫৩)

কোথাও স্বর্ণের কংকন আবার কোথাও রৌপ্যের কংকন পরানোর কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মওদুদী (রাহঃ) বলেন, এ সব কটি আয়াত একত্র করে পাঠ করলে তিনটি অবস্থা সম্ভব বলে মনে হয়। প্রথমতঃ তারা কখনো স্বর্ণের এবং রৌপ্যের কংকন পরতে চাবে, আর উভয় জিনিসই তাদের ইচ্ছেনুযায়ী থাকবে। দ্বিতীয়তঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের কংকন তারা একসঙ্গে পরবে। কেননা, তাতে সৌন্দর্যের মাত্রা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ যার ইচ্ছে হবে স্বর্ণের কংকন পরবে এবং যার ইচ্ছে হবে রৌপ্যের কংকন পরবে।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا–قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا–

তাদের সম্মুখে রৌপ্য নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা আবর্তিত করানো হবে। সে কাঁচ- যা রৌপ্য জাতীয় হবে এবং সেগুলোকে পরিমাণ মতো ভরতি করে রাখা হবে। (দাহ্‌র-১৫-১৬)

অন্যত্র বলা হয়েছে–

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ–وَفِيْهَ

مَاتَشْتَهِيْهِ الاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الاَعْيُنُ-وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ-

তাদের সামনে সোনার থালা ও পান পাত্র আবর্তিত হবে এবং মন ভুলানো ও চোখের তৃপ্তিদানের জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে এখন তোমারা চিরদিন এখানে থাকবে। (যুখরুফ-৭১)

এখানেও দেখা যাচ্ছে কোথাও স্বর্ণের এবং কোথাও রৌপ্যের পাত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে স্বর্ণের অথবা রৌপ্যের পান পাত্র একত্রে অথবা পৃথক পৃথক ব্যবহার করা হবে। তবে রৌপ্যের পাত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যে, সে পাত্রগুলো যদিও রৌপ্যের তৈরী হবে তবুও তা কাঁচের মতো স্বচ্ছ দেখা যাবে, যা দেখলে কাঁচের মতোই মনে হবে কিন্তু কাঁচের মতো ভঙ্গুর হবে না। ঠিক তদ্রুপ স্বচ্ছ বালাখানার কথাও হাদীসে উল্লেখ আছে। বিশ্বনবী বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন বালাখানা আছে (স্বচ্ছতার কারণে) যার ভিতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভিতর থেকে দেখা যায়। (তাবারানী, যাদেরাহ)

আল্লাহর রাসূল আরো বলেন, তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের তৈরী, তাদের ধূপদানী সুগন্ধ কাঠ দিয়ে জ্বালানো হবে। (বুখারী, মুসলিম)

জান্নাতের নিম্ন দেশে নহর প্রবাহিত থাকবে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ-

ঐ সমস্ত ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ! যারা আমলে সালেহ (সৎকাজ) করবে, তাদের জন্য এমন সব বাগান সমূহ আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে নদীসমুহ প্রবাহিত হবে। (আল্‌বাকারা -২৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে-নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে এবং সেখানে অনেক বাগান ও ঝর্ণা থাকবে। (দোখান -৫১-৫২)

সূরা যারিয়াতে বলা হয়েছে-অবশ্য মুত্তাকী লোকেরা সেদিন বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা সমূহের পরিবেষ্টনে অবস্থান করবে। তাদের রব তাদেরকে যা দিবেন সানন্দে তা তারা গ্রহণ করতে থাকবে। (এটা এজন্য যে,) তারা এর আগে মুহসিন (সদাচারী) বান্দা হিসাবে পরিচিত ছিলো। (যারিয়াত-১৫-১৬)

বাগান সমূহের নীচ দিয়ে নদী প্রবাহের অর্থ হচ্ছে, বাগান সমূহের পাশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহমান থাকবে। কেননা বাগ-বাগিচা যদিও নদীর কিনারে হয় তবু তা নদী থেকে একটু উঁচু জায়গায়ই হয়ে থাকে এবং নদী ও বাগান থেকে সামান্য নীচু দিয়েই প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে সমস্ত জায়গায় ঝর্ণার কথা বলা হয়েছে সেখানে বাগান এবং ঝর্ণা একত্রে থাকবে একথাই বলা হয়েছে। আমরা জানি বাগানের মধ্যে বা একই সমতলে ঝর্ণা থাকা সম্ভব। শুধু সম্ভবই নয় বাগানের শোভা বর্ধনের একটি অন্যতম উৎস ও বটে। তাই কুরআনের ভাষা হচ্ছেঃ সেদিন তারা বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণা সমূহের পরিবেষ্টনে অবস্থান করবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–জান্নাতের ছায়া তাদের উপর বিস্তৃত হয়ে থাকবে এবং তার ফল সমূহ সর্বদা আয়ত্বের মধ্যে থাকবে। (দাহর-১৪)

একই জায়গায় নানা ধরনের ফুল-ফলের বাগান, বড়ো বড়ো ছায়াদার বৃক্ষরাজি, ঝর্ণাসমূহ, সাথে বিশাল আয়তনের অট্টালিকাসমূহ, পাশ দিয়ে প্রবাহমান নদী-নালা, একত্রে এগুলোর সমাবেশ ঘটলে পরিবেশ কতো মোহিনী মনোমুগ্ধকর হতে পারে তা লিখে বা বর্ণনা করে বুঝানো কোন ক্রমেই সম্ভব নয় শুধুমাত্র মনের চোখে কল্পনার ছবি দেখলে কিছুমাত্র অনুমান করা সম্ভব । জান্নাতে মোট চার ধরনের নদী প্রবাহিত হবে। যথা- (১) পানি (২) দুধ (৩) মধু (৪) শরাব। তাছাড়া তিন ধরনের ঝর্ণা প্রবাহমান থাকবে। (১) কাফুর নামক ঝর্ণা । এর পানি সুঘ্রাণ এবং সুশীতল। (২) সালসাবিল' নামক ঝর্ণা । এর পানি ফুটন্ত চা ও কফির ন্যায় সুগন্ধযুক্ত ও উত্তপ্ত থাকবে। (৩) তাছনীন নামক ঝর্ণা। এর পানি থাকবে নাতিশীতোষ্ণ।

জান্নাতে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির নদী প্রবাহমান থাকবে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ-فِيْهَا اَنْهرٌ-مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اسِنٍ-وَاَنْهرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُه-وَاَنْهرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّرِبِيْنَ-وَاَنْهرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى-

মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিলো তার পরিচয় হচ্ছে, সেখানে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির নদী প্রবাহমান থাকবে। এমন দুধের নদী প্রবাহিত হবে যা কখনো বিস্বাদ হবে না। এমন শরাবের নদী প্রবাহিত হবে যা পানকারীদের

জন্য সুস্বাদু ও সুপেয় (নেশাহীন) হবে। (তাছাড়া) স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মধুর নদীও প্রবাহিত হবে। (সূরা মুহাম্মদ-১৫)

জান্নাতীদের খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–মুত্তাকী লোকেরা সেখানে বাগান সমূহে ও নিয়ামত সম্ভারের মধ্যে অবস্থান করবে। মজা ও স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে সে সব জিনিসের যা তাদের রব তাদেরকে দিবেন। আর তাদের রব তাদেরকে জাহান্নামের আজাব হতে রক্ষা করবেন। (তাদেরকে বলা হবে) খাও এবং পান করো মজা ও তৃপ্তির সাথে। এটা তো তোমাদের সে সব কাজের প্রতিফল যা তোমরা (পৃথিবীতে) করছিলে। (তুর-১৭-১৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে–সেখানে তারা বাঞ্ছিত সুখভোগে লিপ্ত থাকবে। (তাদের অবস্থান হবে) জান্নাতের উচ্চতম স্থানে। যার ফল সমূহের গুচ্ছ ঝুলতে থাকবে। (বলা হবে) খাও এবং পান করো, তৃপ্তি সহকারে। সে সব আমলের বিনিময় যা তোমরা অতীত দিনে করেছো। (আল্ হাক্কাহ–২১-২৪)

জান্নাতে কোন কোলাহল থাকবে না

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন–

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ–

সেখানে তাদের জন্য সর্ব প্রকারের ফল থাকবে এবং আরও থাকবে তাদের রবের নিকট হতে ক্ষমা। (মুহাম্মদ-১৫)

সূরা ওয়াকিয়ায় বলা হয়েছে–আর খাদেমগন তাদের সামনে রং বেরংয়ের ফল পেশ করবে, যেনো তারা তাদের যা পছন্দ তাই তুলে নিতে পারে। এছাড়া (বিভিন্ন) পাখীর গোশতও সামনে রাখবে, যে পাখীর গোশত ইচ্ছে নিয়ে খেতে পারবে।

সূরা আত্-তুরে বলা হয়েছে–আমরা তাদেরকে ফল গোশ্ত তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী খুব বেশী বেশী করে দিতে থাকবো। তারা প্রতিযোগীতামূলকভাবে পানপাত্র সমূহ গ্রহণ করতে থাকবে কিন্তু সেখানে কোন প্রকার হৈ-হল্লা বা কোলাহল হবে না।

জান্নাতের পানীয় দ্রব্যের ধরন

পানীয় দ্রব্যের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সূরা সাফ্ফাত-এ বলা হয়েছে–

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ–بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّرِبِيْنَ–لاَفِيْهَا غَوْلٌ وَّلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ–

শরাবের ঝর্ণা সমূহ হতে পানপাত্র পূর্ণ করে তাদের মধ্যে পরিবেশন করা হবে। তা উজ্জ্বল পানীয়, পানকারীদের জন্য সুপেয় ও সুস্বাদু হবে কিন্তু তাদের দেহে সেটা কোন ক্ষতি করবেনা এবং তাদের বোধ শক্তিও বিলোপ হবে না।

যদিও শরাবের আকৃতি পৃথিবীর শরাবের মতো দেখা যাবে কিন্তু তা হবে অত্যন্ত পবিত্র ও সুগন্ধযুক্ত। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا–

তাদের রব তাদেরকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন (নেশাহীন) শরাব পান করাবেন। (দাহর–২১)

সূরা দাহ্র-এর ১৭-১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً–عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلاً–

তাদেরকে সেখানে এমন সূরাপাত্র পান করানো হবে যাতে আদ্রক জাতীয় দ্রব্যের সংমিশ্রন থাকবে। এটা হবে জান্নাতের সালসাবিল নামক ঝর্ণাধারা।

উক্ত শরাবের আরো দু'টি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে-সুরা মুতাফ্ফিফীনে–

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ–خِتٰمُه مِسْكٌ–وَفِىْ ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ الْمُتَنَا فِسُوْنَ–

তাদেরকে উত্তম উৎকৃষ্ট মুখবন্ধকৃত শরাব পান করানো হবে এবং তার উপর মিশ্কের সীল লাগানো থাকবে। (মুতাফ্ফিফীন–২৫-২৬)

وَمِزَاجُه مِنْ تَسْنِيْمٍ–عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ–

সে শরাবে তাসনীম মিশ্রিত হবে। এটা একটি ঝর্ণা। সে ঝর্ণার পানির সাথে নিকটবর্তী লোকেরা শরাব পান করবে। (মুতাফ্ফিফীন– ২৭-২৮)

জান্নাতীদের মল-মুত্র ত্যাগ করতে হবে না

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণনা করেছেন যে–তিনি বলেছেন, জান্নাতীগণ জান্নাতের খাবার খাবে এবং পানীয় বস্তু পান করবে কিন্তু সেখানে তাদের পায়খানা প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে না, এমনকি তাদের নাকে ময়লাও জমবে না। ঢেকুরের মাধ্যমে তাদের পেটের খাদ্র দ্রব্য হজম হয়ে

মিশ্‌কের সুগন্ধির মতো বেরিয়ে যাবে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতোই তারা তাসবীহ্ তাকবীরে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।' (মুসলিম)

অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তাদেরকে পেশাব পায়খানা করতে হবে না, মুখে থুথু আসবেনা, আর নাকে কোনরূপ ময়লা জমবে না।' (বুখারী, মুসলিম)

জান্নাতের ফল-মূল

আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে–

أُولَـٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ-فَوَاكِهُ-وَهُمْ مُكْرَمُونَ-

তাদের জন্য চেনা-জানা রিজিক রয়েছে। সর্ব প্রকার সুস্বাদু দ্রব্যাদি এবং সেখানে তারা সম্মানের সাথে বসবাস করবে। (আছ্-ছাফ্‌ফাত–৪১-৪২)

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে–

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا-قَالُوا هَـٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ-وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا-

জান্নাতের ফল দেখতে পৃথিবীর ফলের মতোই হবে। যখন কোন ফল তাদের দেয়া হবে খাবার জন্য, তখন তারা বলবে– এ ধরনের ফল তো আমরা পৃথিবীতেই খেয়েছি। (সূরা বাকারা-২৫)

ফলগুলো যদিও পৃথিবীর মতো হবে কিন্তু স্বাদে ও গন্ধে সম্পূর্ণ উন্নত ও ভিন্ন ধরনের হবে। প্রতিবার খাওয়ার সময়ই তার স্বাদ গন্ধ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, পৃথিবীতে দুঃখ আছে বলেই সুখকে আমরা উপভোগ করতে পারি কিন্তু জান্নাতে যদি দুঃখ না থাকে তবে শুধু সুখ উপভোগ করা যাবে কি? বা সুখ ভোগ করতে করতে একঘেয়েমি লাগবে না? এর দু'টি উত্তর হতে পারে। প্রথমতঃ জান্নাতীগণ জাহান্নামীদের অবস্থা অবলোকন করতে পারবে এবং কথোপোকথনও হবে তাই তাদের সুখকে জাহান্নামীদের সাথে তুলনা করতে কষ্ট হবে না এবং সে সুখে এক ঘেয়েমিও আসবে না। দ্বিতীয়তঃ দুঃখ না থাকলেও সুখের মাত্রা স্থিতিশীল হবে না, পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কাজেই সে সুখভোগ কখনো ক্লান্তি আসবে না বরং সুখভোগের অনুভূতি তীব্র হতে তীব্রতর হবে।

জান্নাতে আত্মীয়-স্বজন

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ–

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান ও ঈমানের কোন মাত্রায় তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, তাদের সে সন্তানদেরকে আমরা (জান্নাতে) তাদের সাথে একত্রিত করবো, আর তাদের আমলে কোন কমতি করা হবে না। (তুর–২১)

সুরা রা'দে বলা হয়েছে–তারাতো চিরন্তন জান্নাতে প্রবেশ করবেই, তাদের সাথে তাদের বাপ-দাদা, তাদের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা, সৎ ও নেক্কার তারাও তাদের সাথে সেখানে (জান্নাতে) যাবে। ফেরেশতাগণ চারদিক হতে তাদেরকে সম্বর্ধনা দিতে আসবে এবং বলবে তোমাদের প্রতি শান্তি। (রা'দ–২৩)

সন্তানগণ যদি বাপদাদার মতো উত্তম ঈমান এবং আমলের অধিকারী না-ও হয় শুধুমাত্র জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্যতা অর্জন করে তবে পিতৃপুরুষদের উত্তম আমলের বদৌলতে এবং তাদের মর্যাদার দিকে চেয়ে ঐ সন্তানগণকেও ঐ রকম মর্যাদা দিয়ে একত্রিত করা হবে। কিন্তু সন্তানের সাথে মিলনের জন্য বাপদাদার মর্যাদার হ্রাস করা হবে না, আর সে মিলন ক্ষণস্থায়ী হবে না, তা হবে চিরস্থায়ী।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যু বরণ করে তাদের কথা বলা হয়নি, কেননা তাদের ব্যাপারে তো কুফুর, ঈমান, আল্লাহর অনুগত্য ও নাফরমানীর প্রশ্নই উঠে না। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তারা এমনিই জান্নাতে যাবে এবং মা বাপের সন্তোষ্টির জন্য তাদের সাথে একত্রিত করে দেয়া হবে।

জান্নাতীদের শ্রেণী বিভাগ

আল্লাহর কোরআনে জান্নাতীদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ (১) ডান বাহুর লোক (২) অগ্রবর্তী লোক। সূরা ওয়াকিয়ায় বলা হচ্ছে–

فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ–مَااَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ–

অতঃপর ডানবাহুর লোক। ডানবাহুর লোকের (সৌভাগ্যের কথা) কি বলা যায়?

মহান আল্লাহ বলেন–

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ-اُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ-

আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো (সকল ব্যাপারে) অগ্রবর্তীই। তারাই তো সান্নিধ্যশালী লোক। (ওয়াকীয়া– ১০-১১)

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'জান্নাতীরা তাদের উপরতলার কক্ষের লোকদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন করে তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জল তারকাগুলো দেখতে পাও। তাদের পরস্পর মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এরূপ হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ স্তর গুলো কি নবীদের যা অন্য কেউ লাভ করতে পারবে না? তিনি বললেনঃ কেন পারবে না। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ। যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং নবীদেরকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারা ঐ স্তরে যেতে সক্ষম হবে।' (বুখারী, মুসলিম)

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, জান্নাতীদের আমলের তারতম্যের কারণে সেখানে তাদের মর্যাদাও বিভিন্ন রকম হবে। অনেক হাদীসে জান্নাতীদের নেয়ামতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে নিম্নমানের এক জান্নাতীকে নানা বস্তু দেয়া হবে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতীদেরকে আল্লাহ তাদের আমল ও মর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন মানের জান্নাত দিবেন। নিম্নোক্ত হাদীস দু'টো এ কথারই প্রমান করে।

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, সবচেয়ে নিম্নমানের একজন জান্নাতী ৮০ হাজার খাদেম, ৭২জন স্ত্রী পাবে। এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীগণ যে সমস্ত ওড়না ব্যবহার করবে তার মধ্যে জামরুদ, মুক্তা ও ইয়াকুতের কারুকার্য খচিত হবে। (তিরমিজি)

বিশ্বনবী বলেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন–আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য যা কিছু রেখেছি তা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান তা শুনেনি, কোন হৃদয়ও তা কল্পনা করতে পারেনি। (হাদীসে কুদ্‌সী-বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের যে আলোচনা করা হয়েছে তা সাধারণভাবে সকল জান্নাতীদের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু যারা আল্লাহর প্রিয় ও সালেহ বান্দাহ তাদেরকে এর অতিরিক্ত আরও কিছু দিবেন তার বর্ণনা আল্লাহ কোথাও করেননি। শুধু এ ইঙ্গিতটুকু দেয়াই যথেষ্ট মনে করেছেন।

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর প্রভূকে জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে কম মর্যাদার জান্নাতী কে? আল্লাহ বললেন, সে ঐ ব্যক্তি যে

জান্নাতীদেরকে জান্নাত বন্টনের পর আসবে। তাকে বলা হবেঃ জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবেঃ হে প্রভু! সব লোক নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান নিয়েছে এবং নিজেদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করেছে, তাই আমি এখন কিভাবে জান্নাতে স্থান পাবো? তাকে বলা হবে, তোমাকে যদি পৃথিবীর কোন বাদশাহ বা শাসকের রাজ্যের সমান এলাকা দেয়া হয়, তবে কি তুমি খুশী হবে? তখন সে বলবে, প্রভূ আমি রাজী আছি। আল্লাহতায়ালা তাকে বলবেনঃ তোমাকে তাই দেয়া হলো। এর পরও তার সমান আরও দেয়া হলো। এরপর তার সামন আরো এবং এরপর ঐগুলোর সমান আরও অতিরিক্ত দেয়া হলো। পঞ্চমবারে সে বলবে, প্রভু! আমি সন্তুষ্ট হলাম। অতপর আল্লাহ বলবেন, তোমাকে সবগুলোর সমান আরও দশগুন দেয়া হলো। সে বলবে, হে প্রভূ আমি খুশী হয়েছি।' (মুসলিম)

রাসূল আরও বলেছেন, এক ব্যক্তি নিতম্বের উপর ভর দিয়ে হেচ্‌ড়াতে হেচ্‌ড়াতে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাকে বলবেন–যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো।

সে জান্নাতের কাছে গেলে তার মনে হবে ইতিমধ্যেই জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন! জান্নাত তো পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। সে আবার যাবে কিন্তু তার মনে হবে ইতিমধ্যে তা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভূ! আমি দেখলাম জান্নাত ভরপুর হয়ে গিয়েছে। তখন সে মহান আল্লাহর কথায় আবার যাবে এবং ফিরে এসে আগের মতোই বলবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি জান্নাতে যাও। কেননা তোমার জন্য পৃথিবীর সমপরিমান এবং অনুরূপ আরো দশগুণ অথবা পৃথিবীর মতো দশগুণ জায়গা নির্মিত হয়েছে। তখন লোকটি বলবে, হে আল্লাহ! আপনিও কি আমাকে বিদ্রূপ করছেন? অথচ আপনি সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ্ তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি দেখলাম আল্লাহর রাসূল একথা বলে এমনভাবে হাসলেন যে তাঁর পবিত্র দাঁত দেখা যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, এ ব্যক্তি হবে সবচেয়ে নিম্ন মর্যাদার জান্নাতী। (বুখারী, মুসলিম)

জান্নাতীদের সবচেয়ে বড় নেয়ামত

জান্নাতে জান্নাতীদের সাথে স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষাৎ করবেন। আল্লাহ্‌র দর্শনের ব্যাপারে আল্-কুরআনে মাত্র দু'জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আল্ কিয়ামাহ্ এবং সূরা আল্ মুতাফ্‌ফিফীনে। বলা হচ্ছে–

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ–اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ–

সেদিন কিছু সংখ্যক মুখমন্ডল উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হবে এবং নিজের রবের দিকে তাকাতে থাকবে। (কিয়ামাহ্– ২২-২৩)

কোরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে–

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ–

কখনই নয়। নিঃসন্দেহে সেদিন এ লোকদেরকে তাদের রব-এর দর্শন হতে বঞ্চিত রাখা হবে। (মুতাফ্‌ফিফীন-১৫)

তাছাড়া বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থেও আল্লাহ্‌র দর্শন প্রসঙ্গে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, সেদিন দর্শনের ব্যাপারটা কিভাবে সম্পন্ন হবে? প্রতি উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। কেননা আমরা পৃথিবীতে কোন বস্তু দেখতে হলে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে দেখে থাকি। যেমনঃ (ক) বস্তুর নির্দিষ্ট একটি আকার আয়তন থাকা। (খ) বস্তুর উপর আলোকের প্রতিফলন ঘটে আমাদের চোখে তার প্রতিবিম্ব পড়া। (গ) প্রতিবিম্বটি উল্টা প্রতিফলিত হয় মস্তিষ্ক তা সোজা করে দেখতে সাহায্য করে। (ঘ) চক্ষু নামক একটি দর্শনেন্দ্রিয় থাকা এবং তা কার্যক্ষম থাকা।

উপরোক্ত শর্তাবলীর ব্যত্যয় ঘটলে দেখা সম্ভব নয়। তখনই প্রশ্ন আসে আল্লাহ্‌তো নিরাকার। উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষে আল্লাহ্ দেখেন না। তবে কি করে তিনি দেখেন? তার উত্তর আমাদের কাছে অজানা। তবে আমরা শুধু এতটুকু বুঝতে পারি যে, যেভাবে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট বিশ্বলোক দেখে থাকেন সেভাবেই মানুষ সেদিন আল্লাহ্‌কে দেখবে অথবা আল্লাহ্ সেদিন অন্য কোন পদ্ধতিতে দেখার ব্যবস্থা করে দেবেন। আল্লাহর রাসূল বলেছেন যে, আল্লাহর কসম, জান্নাতীদের জন্য আল্লাহর দর্শন ব্যতিরেকে অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় আর কিছুই হবে না। (তিরমিজি)

অন্যত্র বলা হয়েছে, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদের বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে হে আমাদের প্রভূ, আমরা উপস্থিত। সমস্ত মঙ্গল ও

কল্যাণ আপনার হাতে, কি আদেশ বলুন! আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি তোমাদের আমলের প্রতিদান পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছো? জান্নাতীগণ জবাব দেবে-হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন সব নেয়ামত দান করেছেন যা অন্য কাউকে দেননি। অতএব আমরা সন্তুষ্ট হবো না কেনো? তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও অধিক উত্তম ও উন্নত জিনিষ দান করবো না? তারা বলবে এর চেয়ে অধিক ও উত্তম বস্তু আর কী হতে পারে? তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি চিরকাল তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবো। কোন দিন আর অসন্তুষ্ট হবো না। অন্য হাদীসে আছে এ কথা শুনে জান্নাতীগণ তাদের সমস্ত নেয়া'মতের কথা ভুলে যাবে। কেননা এ সুসংবাদ-ই হচ্ছে তাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো নেয়ামত। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি)

জান্নাতীদেরকে হাউজে কাউছার থেকে পান করানো হবে

কোরআন হাদীস থেকে জানা যায় কিয়ামতের ময়দানে জান্নাত হতে প্রবাহিত দু'টো পানির ধারা এনে একটা বিশাল হাউজে জমা করা হবে। ওই হাউজটার নাম হলো হাউজে কাউছার। উক্ত হাউজের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মহান আল্লাহ দান করবেন তার সর্বাধিক প্রিয় বন্ধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে। তিনি তাঁর ওই সকল উম্মতকে উক্ত হাউজ হতে পানি পান করাবেন যারা পৃথিবীতে কোরআনের বিধান অনুসরণ করতো।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে হাউযে কাওসারও দান করেছেন। হাওযে কাওসার সম্পর্কে হাদীসে এত অধিক বর্ণনা এসেছে যে, এর যথার্থতা সম্পর্কে একবিন্দু সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। হাউযে কাওসার সম্পর্কে সিয়াহ্ সিত্তাহ্ হাদীসের সমস্ত বর্ণনা গুলো একত্রিত করলে বিশাল একটি গ্রন্থ রচিত হবে। মৃত্যুর পরবর্তীতে জীবনে কিয়ামতের ময়দানে প্রবল তৃষ্ণায় মানুষ যখন পানি পানি করে চিৎকার করতে থাকবে, তখন সেই হাউযে কাওসার থেকে আল্লাহর রাসূল তাঁর অনুসারীদেরকে পানি পান করিয়ে পিপাসা নিবৃত্ত করবেন।

শুধু তাই নয়, জান্নাতেও তাঁকে কাওসার নামক একটি নহর দেয়া হবে। কিয়ামতের ময়দানে রাসূলের সমস্ত উম্মত প্রবল পিপাসায় কাতর হয়ে ছুটবে হাউযে কাওসারের দিকে। রাসূল সে সময়ে হাউযে কাওসারে মাঝখানে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন। রাসূল সবার পিপাসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে পানি দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ

করবেন। এ সময় ঐ লোকগুলোকে দেখিয়ে রাসূলকে বলা হবে, হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকগুলো আপনার আদর্শের সাথে বিরোধিতা করেছে, অনেকে আপনার আদর্শ বিকৃত করেছে এবং নতুন প্রথা উদ্ভাবন করেছে। রাসূল তখন সেই লোকগুলো তাড়িয়ে দেবেন।

হাউযে কাওসার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, জান্নাতের কাওসার নহর থেকে দুটো প্রবাহমান ধারা এনে হাউযে কাওসারের সাথে সংযোগ ঘটানো হবে। এর পানি দুধের বা বরফের অথবা রোপার থেকেও শুভ্র দেখাবে, আরামদায়ক ঠান্ডা হবে এবং মিষ্টির দিক থেকে হবে মধুর থেকেও মিষ্টি। এই হাউযের নিচের মাটি হবে মিশ্কের সুগন্ধিযুক্ত। নিচের অংশে থাকবে মহামূল্যবান হীরা, জহরত ও মণিমুক্তা। এর ওপর দিয়েই অতুলনীয় স্বাদযুক্ত সেই পানি প্রবাহিত হতে থাকবে। এর দুই পাড় হবে স্বর্ণ নির্মিত।

কোন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না

সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা জান্নাতি হবেন তারাই ডান পাশের দলে অবস্থান করবে। জান্নাতে কুমারীগণ ওই সমস্ত নারীই হবেন পৃথিবীতে যারা ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করেছেন। পৃথিবীতে তারা বৃদ্ধা অবস্থায় ইন্তেকাল করলেও জান্নাতে তারা হবেন নব যৌবনা। দুনিয়ায় তারা সুন্দরী অথবা কুৎসিত থাকুন না কেন, জান্নাতে তারা হবেন অকল্পনীয় সুন্দরী। তারা একাধিক সন্তানের মা হয়ে ইন্তেকাল করলেও জান্নাতে হবেন চির কুমারী। স্বামীর সাথে অসংখ্য বার মিলিত হলেও তাদের কুমারীত্ব মুছে যাবে না। এসব সৌভাগ্যবতী নারীগণের স্বামীগণও যদি জান্নাতবাসী হন, তাহলে সেখানে তারা একে অপরকে লাভ করবে। অন্যথায় তাদের নতুন করে বিয়ে হবে।

তিরমিজি শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, একদিন এক বৃদ্ধা নারী আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বললো–ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জন্যে আপনি দোয়া করুন। আমি যেন আল্লাহর জান্নাত লাভ করতে পারি। আল্লাহর রাসূল সাধারণত মৃদু রসিকতা করে মানুষকে অনেক সময় আনন্দ দিতেন। ওই বৃদ্ধার সাথে রসিকতা করে তিনি বললেন, কোন বৃদ্ধা তো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না! (একটা কথা মনে রাখতে হবে, রাসূল রসিকতা করতেন বটে, কিন্তু সে রসিকতা হতো সত্য ও ন্যায় ভিত্তিক। কাল্পনিক কোন কথা বা মিথ্যে কথা দ্বারা তিনি রসিকতা করতেন না)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে বৃদ্ধা হতাশ হয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে চলে যেতে লাগলো। আল্লাহর রাসূল অন্য সাহাবাদের বললেন, তোমরা ওই নারীকে ডেকে বলে দাও, কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। আল্লাহ যে নারীদেরকে জান্নাত দান করবেন তাদেরকে তিনি কুমারী করে পয়দা করবেন।

তাবারানীতে হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে কোরআনে বর্ণিত জান্নাতের কুমারীগণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন। আল্লাহর নবী বলেছিলেন, এরা হলো সেই সব নারী যারা পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করেছিল। আর তারা ছিল বৃদ্ধা। তাদের চোখ ছিল কোঠরাগত। মাথার চুল ছিল পাকা এবং সাদা। তারা এরূপ বৃদ্ধা হবার পরেও আল্লাহ তাদেরকে কুমারী করে পয়দা করবেন।

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তথা আখিরাতের অনন্তকালের জীবনে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা এবং মহানে'মাত মন্ডিত জান্নাত লাভের সর্বপ্রথম শর্ত হলো, ইবাদাত তথা দাসত্ব করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর এবং ইবাদাত হতে হবে শিরক্ মুক্ত। আল্লাহর আদেশে নামাজ-রোজা আদায় করা হলো, সেই সাথে জাগতিক কোনো ব্যাপারে বিপদগ্রস্ত হয়ে বা সন্তান লাভের আশায় পীর সাহেবের দরবারে অথবা মাজারে মৃত মানুষের কাছে গিয়ে সাহায্য চাওয়া হলো। আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানুষের বানানো আইন সন্তুষ্টির সাথে মেনে চলা হলো। আল্লাহর ভয়কে প্রাধান্য না দিয়ে অন্য কোনো শক্তির ভয়কে প্রাধান্য দেয়া হলো আর এসবই হলো শিরক্যুক্ত ইবাদাত। আখিরাতের ময়দানে যে ব্যক্তির আমলনামায় সামান্যতম শিরকের গন্ধ থাকবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার দিকে দৃষ্টি দেবেন না এবং তার আমলনামা ধূলার মতোই উড়িয়ে দেয়া হবে। পরিণামে সে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

সুতরাং জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত তথা দাসত্ব করতে হবে, তাহলে কিয়ামতের কঠিন দিনে আখিরাতের ময়দানে আযাব থেকে মুক্ত থাকা যাবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করা যাবে। মহান আল্লাহ বলেন—

اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ-فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَيُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه اَحَدًا-

এক আল্লাহই তোমাদের ইলাহ, সুতরাং যে তার রব-এর সাক্ষাতের প্রত্যাশী তার সৎকাজ করা উচিত এবং ইবাদাতের (দাসত্বের) ক্ষেত্রে নিজের রব-এর সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়। (সূরা কাহ্ফ-১১০)

আখিরাতের
জীবনচিত্র

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী